দেখে এলাম অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِى الاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ–

এ লোকগুলো কি (আমার) যমীনে বিচরণ করেনা? (বিচরণ করলে) তারা দেখতে পেতো, এদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিলো; অথচ, শক্তিমত্তার দিক থেকে (বলো) এবং যে সব কীর্তি তারা (এ) দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে, (সেদিক থেকে) যমীনে তারা ছিলো (এদের তুলনায়) অনেক বেশী প্রবল। (কিন্তু) আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অবধ্যতার কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করলেন। (তখন) তাদের আল্লাহ তা'য়ালার গযব থেকে রক্ষা করার কেউই ছিলো না। (সূরা মু'মিন-২১)

দেখে এলাম
অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০২-৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯

দেখে এলাম অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই-২০০৭

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী- ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নাবিল কম্পিউটার

৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ মশিউর রহমান

মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ১০০ টাকা মাত্র।

Dekhe Yelam Obish-shashider Koroon Porinati by Moulana Delawar Hossain Sayedee. Co-operated by Rafeeq bin Sayedee. Copyist : Abdus Salam Mitul. Published by Global publishing Network, Dhaka. Price: 100 TK, Only in BD. 3 Doller in USA. 2 Pound in UK.

উ|ৎ|স|র্গ

প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে সুখ-দুঃখের জীবন সাথী................

যাঁর ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা আমার সঙ্কটে– স্বস্তিতে সর্বাবস্থায়

পথ চলার উৎসাহ যুগিয়ে আসছে ......আমার সহধর্মিণী

মুহ্‌তারামা মিসেস সালেহা সাঈদী।

প্রারম্ভিক কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى خَلَقَ الاِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ، وَعَلَّمَ الاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى اٰلِه وَصَحْبِه اَجْمَعِيْنَ-

প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু শখ থাকে; আমার শখ দুনিয়ার যেখানেই যাই প্রাচীন নিদর্শনাবলী পরিদর্শন করা, দুষ্প্রাপ্য বই-কিতাব সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পড়া এবং লেখা। বক্ষমান পুস্তকটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আমার লেখা প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বর্তমান সময় পর্যন্ত পঞ্চান্নটি (৫৫)– আল হামদু লিল্লাহ্।

আল্লাহ তা'য়ালার অপার অনুগ্রহে বিশ্বের ৫টি মহাদেশের অর্ধ শতাধিক দেশ সফরের আমার সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি এই সুন্দর পৃথিবী কত বৈচিত্রপূর্ণ, মনমুগ্ধকর, চিত্তাকর্ষক ও প্রাণী জগতের বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভারে সাজানো-গোছানো তা চোখে না দেখলে বোঝানো দুষ্কর।

আমার শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই আমার দেশ-বিদেশ ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বই লিখে পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আমার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণ কাহিনীমূলক বই লেখার দিকে তেমন মনযোগী হতে পারিনি।

শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ অনুযায়ী মিশর সফরের ওপর লেখা **'নীল দরিয়ার দেশে'** আমার প্রথম প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনীমূলক বই। বলা বাহুল্য বইটি প্রকাশের দু'তিন মাসের মধ্যেই সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। বিগত ১১ জানুয়ারী ০৭ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা হওয়ায় আমার রুটিন মাফিক জীবন চলার পথে হঠাৎ করেই ছন্দ পতন ঘটে। প্রতিদিন পড়া-লেখাসহ যেখানে ২৪ ঘন্টার ১৪/১৫ ঘন্টাই ব্যস্ত সময় কাটতো, সেখানে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বেকারত্ব পেয়ে বসলো আমাকে।

মাস খানেক এই অবস্থায় চলার পর মুক্ত বিহঙ্গের খাঁচা বন্দী জীবনের মতো অস্থির হয়ে উঠলাম। গভীর রাতে রাজাধিরাজ, সম্রাটের সম্রাট বিশ্ব-জাহানের একচ্ছত্র মালিক ও মুনিব আমার রব-এর শাহী দরবারে ধর্ণা দিলাম পবিত্র কা'বা ও মদীনা মুনাওয়ারা সফরের জন্য। চোখের পানি ও প্রাণের আকুতি মুনিবের দরবারে মঞ্জুর হলো।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে ভিজিট ভিসায় আমি যখন পবিত্র নগরী মক্কায় প্রবেশ করেছি, হজ্জ পালনকারীরা তখন কেউ আর অবশিষ্ট নেই। ওমরাহ্ ভিসাও শুরু হয়নি, ফলে হারাম শরীফে ভীড় বলতে তেমন কিছুই নেই। ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু করে ২০০৬ পর্যন্ত যত বার এই প্রাণের কা'বায় এসেছি এমন ভীড়শূন্য মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী জীবনেও পাইনি। এ এক অবর্ণনীয় মানসিক প্রশান্তি। প্রতি তাওয়াফে রুক্‌নে ইয়ামানী স্পর্শ, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন এবং যতক্ষণ খুশী মুলতাজিমে দাঁড়িয়ে বুক ভাসিয়ে কাঁদা, প্রতি ওয়াক্ত নামাজে ইচ্ছে করলেই ইমামের পেছনে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর এক মহাসুযোগ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর এ অধম গোলামকে এনায়েত করলেন।

সপ্তাহকাল পরে চলে এলাম মদীনা মুনাওয়ারায়। এখানেও একই অবস্থা- কোনো ভীড় নেই। প্রতি ওয়াক্ত নামাজ রিয়াদুল জান্নাতে আদায় করা এবং যত বার খুশী আল্লাহ তা'য়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, বিশ্বের সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর কলিজার চাইতে অনেক অনেক দামী- প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে হাজিরা দেয়ার দুর্লভ সুযোগ পেলাম।

আমার মদীনা মুনাওয়ারা সফরের শেষ দিকে সেখানকার সরকারী অনুমোদনে মদীনা থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে মাদায়েনে সালেহ্ ভ্রমণের সুযোগ হলো। কওমে আ'দ, কওমে ছামূদের অবাধ্য বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে শাস্তি দিয়ে গোটা জাতি ধ্বংস করেছেন তা স্বচোক্ষে দেখার সুযোগ হলো।

বর্তমান বইটি **'দেখে এলাম অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতি'** আমার সেই ভ্রমণ কাহিনী। যাতে উদ্ধৃত হয়েছে অবাধ্য জাতিসমূহের লোমহর্ষক করুণ পরিণতির কাহিনী। আশা করি সম্মানীত পাঠক ভাই-বোনেরা এ দ্বারা উপকৃত হবেন, খুঁজে পাবেন জীবন চলার উত্তম পাথেয়।

وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلٰغُ–

মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত ভিখারী

সাঈদী

আরাফাত মঞ্জিল

শহীদ বাগ

ঢাকা।

আলোচ্য সূচী

আলোচ্য সূচী

আলোচ্য সূচী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জরুরী অবস্থার মধ্যে বিদেশ ভ্রমণ

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অসীম রহমতে এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর অর্ধশতেরও অধিক দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে। পরিচিত হয়েছি বিভিন্ন দেশের নানা বর্ণের, নানা ভাষার ও ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুসারী মানুষদের সাথে। আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি অপরূপ, মনোমুগ্ধকর, চিত্তাকর্ষক দৃশ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে মনের গহীনে গুঞ্জন তুলেছে পবিত্র কোরআনের সেই আয়াতটি–

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً–

হে আমার রব! কোনো কিছুই তুমি বৃথা সৃষ্টি করোনি। (সূরা ইমরাণ-১৯১)

প্রত্যেকটি সৃষ্টির পিছনেই মানুষের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টির সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিপতীত হলে প্রথম যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহলো মহান আল্লাহর রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, শৈল্পিক নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ কত যে বিস্ময়কর, কত যে সীমাহীন প্রশংসামূলক– যা দেখে মনে হয় কেনো এক নিপুণ শিল্পী দীর্ঘদিন সাধনা করে সমগ্র সৃষ্টির পরতে পরতে সৌন্দর্যের পশরা সাজিয়ে রেখেছেন।

আমার মহান মালিক আমাকে দু'চোখ ভরে দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি, পাহাড়-পর্বতের সীমাহীন সাম্রাজ্য, অন্তহীন সবুজ শ্যামলিমাময় বনাঞ্চল, নদ-নদী, অগাধ জলধী ও সমুদ্র-মহাসমুদ্র দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি যখন আমার দৃষ্টি নিপতীত হয়েছে, তখনই আমার মনে পড়েছে বিখ্যাত সেই উর্দু কবিতা, যার বাংলা অর্থ–

"যে সকল বস্তু দিয়ে তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যাবো, সে সকল বস্তুর অস্তিত্ব তো তোমারই মুখাপেক্ষী,

যেদিকে তাকাই সেদিকেই তো শুধু তোমাকেই দেখি, তুমি অদৃশ্য ছিলে কবে? তোমার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে কি যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন হয়?

তুমি তো কখনো দূরে ছিলে না, তোমার কাছে পৌঁছার জন্যে নিদর্শন অনুসন্ধান করার তো কোনোই প্রয়োজন নেই,

দৃষ্টিকে যারা অন্ধ বানিয়ে রেখেছে, সে অন্ধ দৃষ্টির ওপরও তুমি সদা দৃশ্যমান, কিন্তু সে দৃষ্টি তোমাকে দেখতে পায় না।

হে আমার পরম প্রিয় স্রষ্টা! তুমি তো তোমার পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরের অস্তিত্ব বিলীন করা রূপ নিয়ে সমগ্র সৃষ্টির প্রত্যেক পরতে চির ভাস্বর, তুমি কিভাবে অদৃশ্য হতে পারো, তুমি কিভাবে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারো, তুমি তো সদা প্রকাশমান!" সুবহান আল্লাহ্!

অতীতে এবং নিকট অতীতে মহান আল্লাহর বিধানের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার জনগোষ্ঠী যখন চূড়ান্তভাবে বিরোধিতা করেছে, মহান আল্লাহর অমোঘ বিধান শাস্তির চাবুক সাথে সাথে হানা হয়েছে। সেসব ধ্বংস প্রাপ্ত কিছু এলাকাও আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে আমাকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। ইটালীর পোম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখেছি, বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি বিরামহীনভাবে অগ্নি উদগীরণ করেছে, চার হাজার ফুট লাভার নীচে চাপা পড়েছে অগণিত আদম সন্তান গর্ভে ধারণ করে আলো ঝলমল বিশাল পম্পেই নগরী– তা-ও দেখেছি।

মিসরের ধনকুবের কারূণ, যার ধন-রত্ন যেসব সিন্দুকে সংরক্ষণ করা হতো সেসব সিন্দুকের চাবি বহন করার জন্যে অগণিত উটের প্রয়োজন হতো। আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহী সেই কারূণ তার সকল ধন-রত্নসহ ৫৬ হাজার একর এলাকাব্যাপী ভূমিধ্বসে যেখানে তলিয়ে গিয়েছে, সেই স্থানও আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দেখিয়েছেন। উক্ত স্থানের বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে, **'বুহায়রা কারূণ'**।

রব-এর দাবীদার ফিরআউন তার সকল সৈন্যবাহিনীসহ যে সাগরে সলিল সমাধি লাভ করেছে, যেখান থেকে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো শিশু মূসা (আঃ)-কে– তা-ও দেখেছি। মিসরের সেই নীলনদের বুকে ভ্রমণ করার সুযোগও মহান আল্লাহ আমাকে করে দিয়েছেন। অভিশপ্ত ফিরআউনের লাশও মিসরের যাদু ঘরে দেখে এসেছি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইসলাম প্রিয় তাওহীদী জনতা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের কথা শোনার জন্যে আল্লাহর এই গোলামকে দাওয়াত দিয়েছে, আমি ক্লান্তিহীনভাবে সেখানেই ছুটে গিয়েছি। আমার মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এটা অসীম রহমত যে, কোরআনের কথা বলার ক্ষেত্রে সামান্যতম ক্লান্তিও আমাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি এবং নাক থেকে যতক্ষণ নিঃশ্বাস চলতে থাকবে, কোরআনের কথা বলার জন্যে ততক্ষণ যেনো কোনো ক্লান্তি আর অবসাদ আমাকে স্পর্শ করতে না পারে, মহান মালিকের কাছে এটাই আমার কাতর প্রার্থনা।

মাতৃভূমির বাইরে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে নিয়েছিলেন তাঁর মহাপবিত্র ঘর বাইতুল্লাহ্য়। ১৯৭২ সালে পাবনার ষ্টেডিয়াম ময়দানে সাত দিনব্যাপী তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমাপণী দিবসে রাতের দ্বিতীয় প্রহরে আমি অগণিত জনতাকে সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত উঠানোর সাথে সাথে স্মরণে এলো কোনোদিন না দেখা পবিত্র কা'বাঘরের কথা। নিজের অজান্তেই আমার দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। আমার বুকের ভেতর থেকে মনের গহীনে চিরদিনের লালিত স্বপ্নের কথাগুলো বেরিয়ে এলো–

হে আমার আল্লাহ! আমি এ পর্যন্ত তোমার যে ঘরকে কেন্দ্র করে তোমাকে সিজ্‌দা দিয়ে আসছি, সে ঘরটি কি তুমি আমাকে আমার এই চোখে দেখাবে না! তোমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে যে সামর্থ্যের প্রয়োজন, তা আমার নেই। কিন্তু তোমার ধনভান্ডার তো অফুরন্ত, শুধু তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট। তুমি আমাকে অনুগ্রহ করে তোমার ঘরকে চোখে দেখে, পবিত্র কা'বাকে সামনে রেখে তোমাকে সিজদা দেয়ার সুযোগ করে দাও মালিক! তুমি আমাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছো, আমাকে তোমার ঘরে যাবার সুযোগ করে দাও মালিক! তোমার প্রিয় হাবীব, আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় তিনি। তাঁর যুগে তুমি আমাকে পাঠাও নি, তাঁকে চোখে দেখতে পাইনি। তাঁর পবিত্র কবর এই চোখে দেখার সুযোগ করে দাও আল্লাহ! কত হাজার মাইল দূর থেকে তোমার প্রিয় হাবীবকে সালাম জানাই, একটি বার তাঁর কবর মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে তোমার শ্রেষ্ঠ নবী (সাঃ)-কে সালাম জানানোর আয়োজন তুমি করে দাও আল্লাহ!

আমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আর রাতের নিস্তব্দতা ভেঙে অগণিত মানুষ আর্তনাদ করে কেঁদে কেঁদে আমীন আমীন বলে আল্লাহর কাছে দোয়া কবুলের জন্যে করুণ স্বরে মিনতি করছে। আল্লাহ তা'য়ালা দোয়া কবুল করলেন, ১৯৭৩ সনের জানুয়ারী মাসে প্রথম বারের মতো তিনি আমাকে তাঁর পবিত্র কা'বায় গিয়ে হজ্জ

আদায়ের ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর থেকে কত বার যে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে কা'বা শরীফে নিয়েছেন, সে হিসাব আমার পক্ষে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। কা'বা ঘরের দিকে প্রথম যাত্রা করার মধ্য দিয়েই সূচনা হলো আমার বিদেশ ভ্রমণের। এরপর বিশ্বের চারটি মহাদেশের অর্ধশতাধিক দেশে আল্লাহ তা'য়ালা ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছেন। বিদেশ যাত্রার সময় আমি কখনো বাধাগ্রস্ত হইনি। নিজ মাতৃভূমিতে কোরআনের কথা বলার ক্ষেত্রে অসংখ্যবার বাধাগ্রস্ত হয়েছি, কোরআনের কথা বলার অপরাধে (?) ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে আমাকে ৫৪ ধারায় কারাবন্দীও করা হয়েছে। কারাগারে বন্দী জীবনেও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে কোরআনের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন।

বিদেশ যাত্রায় অনুমতি গ্রহণ

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইতোপূর্বে বিদেশে যাবার ব্যাপারে আমি নিজ দেশে কখনো বাধার সম্মুখীন হইনি এবং কারো কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কিন্তু ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারী দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরে অনেকের প্রতিই বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলো এবং সরকারের দৃষ্টিতে 'গুরুত্বপূর্ণ' ব্যক্তিদের বিদেশ গমনের ক্ষেত্রেও 'অনুমতি গ্রহণ' বাধ্যতামূলক আইন করা হলো।

২২শে জানুয়ারী ২০০৭-এ সংসদ নির্বাচন বাতিলসহ প্রকাশ্য রাজনীতি ও সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হলো। আমার কর্ম জীবনে প্রবেশের বয়স থেকে রুটীন মাফিক কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার সারা জীবনের অভ্যাস অতি প্রত্যুষ্যে ঘুম থেকে জেগে ফজর আদায় করা, তিলাওয়াত করা, বইপড়া, বই লেখা, পত্রিকা পড়া, নাস্তা করা ও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের প্রয়োজন মেটানো। এগুলো করতে করতে সকাল দশটা সাড়ে দশটা হয়ে যায়।

এরপর নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন কাজে সচিবালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রয়োজনে সংসদ ভবনের কাজ সেরে জোহর শেষে বাসায় ফেরা, দ্বিপ্রহরের আহার গ্রহণ, ঘন্টা দু'য়েক বিশ্রাম এবং আসর শেষে আবার দেশ-বিদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত লোকদের সাক্ষাৎ প্রদান, নির্ধারিত সাংগঠনিক কাজে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসে গমন, ইশার নামাজ আদায় আগামী কালের অফিসিয়াল কাজের কাগজ-পত্র প্রস্তুতকরণ ও পুনরায় পড়ালেখায় মনোনিবেশ। রাত দশটায় রাতের খাবার গ্রহণ, একই সাথে রাতের খবর দেখা, রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত

বাড়ির ছাদে পায়চারী করা শেষে রাতের নিদ্রা গ্রহণ। এর মধ্যে আমার দেশের বিভিন্ন জেলায় পূর্ব নির্ধারিত তারিখ সমূহে তাফসীর মাহফিলে যোগদান করা।

গড়ে প্রত্যহ ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা কাজে ব্যস্ত থাকার মানুষ আমি। কিন্তু দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা হওয়ায় হঠাৎ করেই জীবন যাত্রায় ছন্দ পতন ঘটলো। পেয়ে বসলো বেকারত্বের চরম অলসতায়। এ অবস্থায় মাসাধিককাল কাটতে কাটতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। মন উতালা হয়ে উঠলো পবিত্র মক্কা-মদীনায় যাবার জন্য। স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম ওমরাহ্ পালনের। কিন্তু বিদেশ সফর জরুরী অবস্থায় আগের মতো মোটেও সহজ নয়। তাই প্রায় প্রতি রাতের শেষ ভাগে আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন প্রাণের আকুতি জানাতে থাকলাম মা'বুদের দরবারে।

ইত্যাবসরে আমার ছোট ভাই **হুমায়ূন কবীর সাঈদী** পিরোজপুর গ্রামের বাড়ি থেকে আমার মা'কে নিয়ে এলো ঢাকায়। আমরা তিন ভাই, আমি ভাইদের মধ্যে বড়। আমার পরে **আলহাজ মোস্তফা আহ্সান সাঈদী**, ওর ছোট হুমায়ুন কবীর সাঈদী।

আমার পরম সৌভাগ্য আমার গর্ভধারিণী মা এখনো জীবিত আছেন। বয়স নব্বুইয়ের কাছাকাছি। এখনো তিনি চশমা ছাড়াই তিলাওয়াত করা, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা, ফরজসহ নফল ইবাদাত করা, নিয়মিত শেষ রাতে জাগা, এসবই তিনি অনায়াসে করতে পারেন।

ওমরাহ্ সফরের সফরের জন্য চরম অস্থিরতার এক পর্যায়ে আমরা তিন ভাই ও আমার বোন **ফাতেমা (হাওয়া)** একত্রে মায়ের পায়ের কাছে বসে আবেদন করলাম, **'মা! নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী মায়ের দোয়া সন্তানের জন্য অবশ্যই মঞ্জুর হবে। আমি পবিত্র কা'বা শরীফে ও মদীনা মুনাওয়ারায় যেতে চাই। আপনি আমার ওমরাহ্র জন্য দোয়া করুন, আমার কাজটি যেনো আসান হয়ে যায়'** ।

আমার মমতাময়ী পরম স্নেহময়ী মা আমাদের নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন, তিনি নিজেও কাঁদলেন আমাদেরকেও কাঁদালেন। বিশাল আকাশের ও বিস্তীর্ণ জমীনের কুল-কায়েনাতের একচ্ছত্র অধিপতি রাব্বুল আলামীন একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ করে দোয়া মঞ্জুর করলেন।

আমার আল্লাহর দয়া অপরিসীম, তিনি অনুগ্রহ করে একটি ভিজিট (Visit) ভিসার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি একান্ত বাধ্য না হলে বিদেশ সফরের সময় বাংলাদেশ বিমান ব্যতীত অন্য কোনো এয়ারলাইন্সের টিকেট কিনি না। নিজ দেশের

এয়ারলাইন্সের টিকেট কিনলে সে অর্থ নিজের দেশেই থেকে যায়। কিন্তু এবারে বাংলাদেশ বিমানে সিট পেতে দেরী হবে জানতে পেরে বাধ্য হয়েই সাউদী এয়ারলাইন্সের টিকেট কিনতে হলো। এরপরই জানতে পারলাম, দেশের বাইরে যেতে হলে বর্তমান সরকার প্রধানের কাছ থেকে আমাকেও অনুমতি নিতে হবে।

যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরম করুণায় আল্লাহ তা'য়ালার রহমতে সহজেই অনুমতি পেয়ে গেলাম। এরপর ২০০৭ মার্চ মাসের ৯ তারিখে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে সাউদী এয়ারলাইন্সে উঠে বসলাম। সুপরিসর সাউদী উড়োজাহাজ আকাশে ডানা মেলে দিলো, বিশাল আকৃতির উড়ো জাহাজটি কয়েক শত আদম সন্তান গর্ভে ধারণ করে তীব্র গতিতে এগিয়ে চললো সাউদী আরবের দিকে। শহর নগর-বন্দর, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, নদী-সাগর পার হয়ে দীর্ঘ সাত ঘন্টা ওড়ার পরে সাউদী আরবের জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করলো।

বন্দর নগরী জেদ্দায়

বিশাল এলাকা জুড়ে জেদ্দা এয়ারপোর্ট নির্মাণ করা হয়েছে। পবিত্র হজ্জ আদায়ের জন্যে আগত আল্লাহর মেহমানদের জন্যে রয়েছে পৃথক টার্মিনাল। সাউদী আরবের অভ্যন্তরে যাতায়াতের জন্যে রয়েছে আরেকটি। সাউদী এয়ারলাইন্স অবতরণের জন্যে রয়েছে পৃথক একটি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের এয়ারলাইন্সের জন্যে রয়েছে পৃথক টার্মিনাল। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এবারে আমি সাউদী এয়ার লাইন্সের টিকেট কিনতে বাধ্য হয়েছিলাম। এ কারণে সাউদী এয়ারলাইন্সের জন্যে নির্মিত টার্মিনালেই নামতে হলো। জেদ্দা নামকরণ করা হয়েছে সমগ্র মানুষের আদি মাতা হযরত হাওয়া (আঃ)-এর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে। দাবী করা হয়, এখানেই হযরত হাওয়া (আঃ)-এর কবর রয়েছে এবং কবরের স্থানটি সংরক্ষণও করা হয়েছে।

সাধারণত মানুষ এভাবে বংশধারা হিসাব করে থাকে যে, পিতার যিনি মাতা, তার সন্তান আমার পিতা। পিতার যিনি মাতা অর্থাৎ দাদীর মাতা বা পিতার নানী সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন কিছু জানার অবকাশ বা সুযোগ থাকে না। এ কারণে বর্ণনা করার সময় দাদীর মা সম্পর্কে উল্লেখও করা হয় না। অর্থাৎ বিষয়টি যেনো এমন যে, দাদী থেকেই আমাদের সূচনা। এ ধারণা থেকেই বোধহয় হযরত হাওয়া (আঃ)-কে দাদী হিসেবে স্মরণ করার জন্যেই এই বন্দর নগরীর নামকারণ করা হয়েছে জেদ্দা বা দাদী।

এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বাইরে আসতেই দেখি, আমাকে নেয়ার জন্যে এসেছেন **জনাব শহিদুল ইসলাম, হাফেজ আব্দুস সালাম, হাফেজ নাসিরসহ** অনেকেই। উপস্থিত সকলের সাথে কুশল বিনিময়ের পর গাড়িতে উঠে বসলাম। ইচ্ছে ছিলো এখান থেকে সরাসরি মক্কায় বায়তুল্লাহ্ শরীফে গিয়ে প্রথমে উমরাহ্ আদায় করবো। কিন্তু **শহীদুল ইসলাম সাহেবের** অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। তাঁর জেদ্দাস্থ বাসায় যেতে হলো। ওখানেই রাতের আহার সেরে স্থানীয় সময় রাত এগারটায় **হাফেজ আব্দুস সালাম ও হাফেজ নাসিরকে** সাথে নিয়ে রওয়ানা দিলাম পবিত্র নগরী মক্কার দিকে।

অনেক দিন না পাওয়া সুযোগ

রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে গাড়ি ছুটে চললো সেই পবিত্র নগরীর দিকে যেখানে রয়েছে পবিত্র বায়তুল্লাহ্। নবী করীম (সাঃ)-পরম প্রিয় জন্মভূমি। ইসলাম বিরোধী শক্তির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি যখন মদীনায় হিজরত করেন, হিজরতের সেই রাতে তিনি বায়তুল্লাহর দিকে তাকিয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'হে কা'বা! তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সকল কিছুর থেকে অতি প্রিয়। কিন্তু এখানের নিষ্ঠুর অধিবাসিরা আমাকে তোমার পাশে থাকতে দিলো না।'

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আমাকে কত বার তাঁর পবিত্র কা'বায় নিয়েছেন, তা স্মরণে রাখতে পারিনি। কিন্তু প্রত্যেক বারই কা'বার দিকে যাবার সময় আমার মনে হয়েছে, এই বুঝি প্রথম যাচ্ছি। পবিত্র কা'বা কখনো আমার কাছে পুরনো হয়নি। পবিত্র কোরআন যেমন কখনো পুরনো হয়নি এবং হবেও না, তেমনি পবিত্র কা'বাও মুমিনদের কাছে কখনো পুরনো হবে না। কা'বা শরীফের দিকে যাবার সময় প্রত্যেক বারই মুমিনের মন এক অপার্থিব আনন্দে উদ্বেলিত হতে থাকে।

অল্প সময়ের মধ্যেই পবিত্র কা'বা শরীফে পৌঁছে গেলাম। পবিত্র মসজিদুল হারামে প্রবেশের জন্যে ৯৬টি প্রবেশ পথ এবং প্রত্যেক প্রবেশ পথের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে বিশাল প্রবেশ পথ রয়েছে, এর নাম **'বাবে মালিক আব্দুল আযীয'**। 'বাব' আরবী শব্দ, এর অর্থ দরজা। বাদশাহ সাউদ-এর পিতার নাম আব্দুল আযীয। তাঁর নামেই এই প্রবেশ পথের নামকরণ করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ প্রবেশ পথের নামকরণ করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামী

ঐতিহ্যসমূহের নামে। মক্কা নগরীর মিস্‌ফলাহ্‌ এলাকা থেকে আগত লোকজন সাধারণত **'বাবে মালিক আব্দুল আযীয'** নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে পবিত্র কা'বার দিকে এগিয়ে যান।

বাংলাদেশে ফজরের নামাজ আদায় করে সাউদী আরবে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া এবং একটানা সাত ঘন্টা আকাশ পথে জার্ণী করে এখানে পৌছা, শরীর প্রচন্ড ক্লান্তিতে যেনো ভেঙ্গে পড়ছিলো। এখন স্থানীয় সময় রাত প্রায় ১টা, বাংলাদেশে এখন রাত ৪টা। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে পবিত্র কা'বার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হবার সাথে আমার দেহ থেকে ক্লান্তির শেষ রেশটুকুও যেনো ঝরে পড়লো। আরেকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করতেই আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেলো। বায়তুল্লাহ্‌ শরীফে সবসময় এত ভীড় থাকে, বিশেষ করে হজ্জ ও রজমানে অকল্পনীয় ভীড় থাকে। ভীড়ের কারণে হাজ্‌রে আসওয়াদে চুমো দেয়া, মুলতাজিম অর্থাৎ পবিত্র কা'বা শরীফের দরজার কাছে যাওয়া, হাতীমে প্রবেশ করা, মিজাবে রহমাতের নীচে দাঁড়ানো এবং মাকামে ইবরাহীমের কাছে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এসব জায়গায় ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কি করে মানুষকে কষ্ট দিয়ে যাওয়া মোটেও উচিত নয়। যদিও অধিকাংশ মানুষ আবেগ-উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে অন্যকে কষ্ট দিয়ে হলেও উক্ত পবিত্র স্থান এবং দোয়া কবুলের জায়গাসমূহে যাবার চেষ্টা করে। মানুষকে কষ্ট দেয়া মোটেও উচিত নয়, এভাবে ধাক্কাধাক্কি করে সাহাবায়ে কেরামের একজনও এবং সাল্‌ফে সালেহীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের কেউ-ই দোয়া কবুলের স্থানসমূহে গিয়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।

সুতরাং যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানেই অবস্থান করে দোয়া করা উচিত। হাজ্‌রে আসওয়াদে চুমো দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। কাউকে কষ্ট না দিয়ে যদি চুমো দেয়ার সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে খুবই ভালো। আর যদি ভীড় থাকে তাহলে দূর থেকে হাত বা হাতের ছড়ির মাধ্যমে ইশারা করে চুমো দিতে হবে। নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম এমনই করেছেন।

তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাআত ওয়াজিব নামাজ আদায় করতে হয়। **'মাকামে ইবরাহীমের পিছনে'** বলতে উক্ত স্থানের পিছনের অংশটুকুই বুঝায় না। উক্ত স্থানের পিছনের অনেক দূরের অংশও বুঝায়। সুতরাং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে যেখানেই সুযোগ পাওয়া যাবে সেখানেই উক্ত দুই

রাকাআত নামাজ আদায় করতে হবে। কারো ঘাড়ের ওপর পা দিয়ে বা ধাক্কাধাক্কি করে একেবারে মাকামে ইবরাহীমের কাছে যেয়ে নামাজ আদায় করা জরুরী নয়। এভাবে করলে গোনাহ্গার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

এবারে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম ভীড় অনেক কম। দোয়া কবুলের উক্ত স্থানসমূহে সহজেই যাওয়া যাবে। এ কারণে আমার আনন্দ বহুগুণ বৃদ্ধি পেলো এবং আমি মহান আল্লাহর শোকর আদায় করলাম।

তিমিরাচ্ছন্ন রাতের সূচিভেদ্য নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে পূর্বাশার প্রান্তে নবারুণ উদিত হয়ে ক্রমশ পশ্চিম দিগন্তে এগিয়ে যেতে থাকে। এক সময় সূর্য পশ্চিম দিকচক্রবালের আড়ালে চলে যায়, দুনিয়ার অফিস-আদালতগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। আর রাত যত গভীর হতে থাকে, মহান আল্লাহর রহমতের দরজাসমূহ ততই কর্ম-চঞ্চল হয়। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা রাতের বিশেষ অংশে প্রথম আকাশ থেকে তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, **'কে আছো বিপদগ্রস্ত, বিপদের কথা আমার কাছে বলো। আমি বিপদ থেকে উদ্ধার করবো। কে আছো ঋণগ্রস্ত, আমার কাছে আবেদন করো। আমি ঋণ থেকে মুক্তি দিবো। কে আছো রোগগ্রস্ত, আমার কাছে প্রার্থনা করো। আমি রোগ থেকে মুক্তি দিবো। কার কি চাওয়ার আছে, আমার কাছে চাও। আমি প্রার্থনা পূরণ করবো।'**

গভীর রাত। পবিত্র কা'বা শরীফ তথা দোয়া কবুলের শ্রেষ্ঠ স্থানসমূহ আমার সামনে। তেমন ভীড়ও নেই। শ্রাবণের বারি ধারার মতো অঝোর ধারায় পবিত্র কা'বার ওপর রহমতের বর্ষণ হচ্ছে। রহমতের বৃষ্টি ধারায় দেহ-মন সিক্ত করার এই অপূর্ব সুযোগ আমি হারাতে চাই না। মহান মালিকের রহমতের ভান্ডার **'লুটে নেয়ার'** এই অভূতপূর্ব সুযোগ অনেক দিন পর পেয়েছি, সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এখন আমার কাছে মহামূল্যবান। এই সময়কে আমি কাজে লাগাবো। ভয়-কম্পিত হৃদয়ে, দুরু দুরু বুকে- অনুতাপে নতশীরে, অশ্রু সজল চোখে আমি এগিয়ে গেলাম মহাপবিত্র বায়তুল্লাহর দিকে।

মসজিদুল হারামের সিঁড়ি বেয়ে মাতাফে (তাওয়াফের স্থানকে মাতাফ বলা হয়) নেমে এলাম। পবিত্র কা'বা শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হাজ্‌রে আসওয়াদ অবস্থিত। এই পবিত্র পাথর সোজা দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়ত করতে হয়। তারপর কা'বা শরীফকে বামে রেখে তাওয়াফ করতে হয়। মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহে এবারে

আমি তাওয়াফের প্রায় প্রত্যেক চক্করেই পবিত্র কালো পাথরের কাছে এসে চুমো দেয়ার সুযোগ পেয়েছি। তাওয়াফ আদায় করে মাকামে ইবরাহীমের একান্ত সান্নিধ্যে দুই রাকাআত নামাজ আদায়েরও সুযোগ পেয়েছি। এরপর সাফা-মারওয়ায় গিয়ে সা'ঈ করে উমরাহ্ শেষ করলাম।

এবারে মক্কায় আমার অবস্থান

আমি পবিত্র মক্কা নগরীতে এলে সাধারণত **সাহাবউদ্দিনের** হোটেলে অবস্থান করি। **দারুস্ সা'য়াদ** নামক সুন্দর হোটেলটি সম্পর্কে কিছু না লিখলে সাহাবউদ্দিনের প্রতি অবিচার করা হবে। বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার বেগম গঞ্জের সন্তান **সাহাবউদ্দিন** মক্কা প্রবাসী। হজ্জ এবং উমরাহ্ আদায় করার জন্যে যারা এখানে আসেন, আত্মীয়-স্বজন থাকলে তাদের অনেকেই আত্মীয়ের বাসাতেই থাকেন। যারা পবিত্র কা'বা শরীফের একান্ত সান্নিধ্যে থাকতে চান, তাঁরা মসজিদুল হারামের আশেপাশে অবস্থিত হোটেল ভাড়া করে থাকেন। বিগত পনের বছরে যত বার আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এখানে এনেছেন, তন্মধ্যে প্রায় দশ বছর এই হোটেলেই আমি থেকেছি।

সাহাবউদ্দিনের হোটেলটি পবিত্র কা'বা শরীফের উত্তর পাশে মারওয়া পাহাড়ের কাছে গাজ্জা নামক এলাকায়। মসজিদুল হারামের খুবই কাছে। মোটামুটি মানসম্পন্ন হোটেল। আমার স্নেহের পাত্রদের মধ্যে **সাহাবউদ্দিন** একজন। ভদ্র এবং উদার প্রকৃতির এই মানুষটির প্রতি আল্লাহ রহম করুন, আমার সেবা-যত্নের প্রতি সে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে যারা এসে তাঁর হোটেলে ভীড় জমায়, সে তাদের প্রতি বিরক্ত না হয়ে বরং সেবা-যত্নের হাত বাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, সকলকে আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা করে।

আমার স্নেহভাজন **আব্দুস সালাম মিতুল** বাংলাদেশেই আমাকে জানিয়েছিলো মক্কা প্রবাসী তার এক বোন রুমা এবং তাঁর স্বামী **মোস্তাফিজুর রহমান** খাবারের দায়িত্ব পালন করতে চায়। খাবার সরবরাহের বিষয়টি মহান আল্লাহ্ দয়া করে আমার জন্যে এমনই স্পর্শকাতর করেছেন যে, প্রবাসে গিয়ে যদি আমার খাবার সরবরাহের দায়িত্ব বিশেষ কারো প্রতি ন্যস্ত করি, তাহলে অনেকে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। এ কারণে আমার স্নেহাস্পদ **হাফেজ নাসির** আমার ভক্তদের মধ্যে বিষয়টি আগে থেকেই বন্টন করে রাখে, যাতে মুহিব্বীনরা কেউ নারাজ না হন।

মসজিদুল হারামের উত্তর পাশে অর্থাৎ আবু কুবাইস পাহাড়ের ওপাশে আযইয়াদ এলাকায় পাহাড়ের ওপর রুমার বাসা। সাত বছরের বড় মেয়ে **হুমায়রা**, ছোট দুই ছেলে **মুহাম্মাদ** ও **আহ্‌মাদ** এবং স্বামী **মোস্তাফিজুর রহমানকে** নিয়ে ওর সংসার। **আব্দুস সালাম মিতুল** মক্কায় আসার সুযোগ পেলে রুমার বাসাতেই থাকে। এখানে আমার আসার সংবাদ মিতুল পূর্বেই ওদেরকে জানিয়ে ছিলো।

আজ ১০ই মার্চ ২০০৭। রুমার স্বামী মোস্তফিজুর রহমান ওরফে মোস্তফার ওপরেই দুপুরের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হলো। মাঝে মধ্যেই প্রায় দশ-পনের জনের খাবারের সমপরিমাণ নানা ধরণের সুস্বাদু খাবার রুমা ওর স্বামী মোস্তফার মাধ্যমে প্রায়ই পাঠাতে থাকলো। আমি অবাক বিস্ময়ে ভাবতাম। বিভিন্ন ধরণের এতগুলো খাবার রান্না করতে বেচারী রুমার কতই না কষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ওকে এর সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।

রুমা আমাকে **'আব্বা'** বলে সম্বোধন করে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাকে কন্যা সন্তান দান করেননি। তিনি আমাকে দয়া করে চারজন পুত্র সন্তান দান করেছেন। আমার এ চার পুত্র সন্তানের সবাই বিবাহিত। ওদের মাধ্যমে ৪জন পুত্র বধু পেয়েছি। আমি এবং আমার স্ত্রী– আমরা দু'জন পুত্র বধুদের নিয়েই কন্যা সন্তানের অভাব পূরণ করি। পরম শ্রদ্ধা ও মমতা জড়ানো কণ্ঠে ওদের মুখে **'আব্বা-আম্মা'** ডাক শুনে এখন মনেই থাকে না যে, আমার কন্যা সন্তান নেই। আমরা দু'জন ওদেরকে পিতামাতার স্নেহ-মমতা দিয়ে আগ্‌লে রাখার চেষ্টা করি। ওরাও আমাদেরকে ওদের ব্যবহার দিয়ে আমার কন্যা সন্তানের অভাব পূরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করে। **ওদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ**

➡ আমাদের বড় পুত্র বধু **মাওলানা রাফীক বিন সাঈদীর** স্ত্রী– দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সাবেক প্রকাশক মরহুম **সাইয়্যেদ হুমায়ুন সাহেবের** জ্যোষ্ঠ কন্যা, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সাবেক নায়েবে আমীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক ও সাহিত্যিক জনাব **খুররম মুরাদ (রহঃ)**-এর ভাগ্নি **সাইয়্যেদা সুমাইয়া ফারাজিয়া**। ওদের তিন সন্তান, ❒ তাসনুভা তামান্না সাঈদী ❒ ইশরাত লুবায়না সাঈদী ❒ মুনাওয়ার হাসনাইন সাঈদী।

➡ মেঝ পুত্র বধুঃ **আলহাজ শামীম সাঈদীর** স্ত্রী– ঢাকা-শান্তিবাগে বসবাসকারী পাবনার বিশিষ্ট সমাজ সেবক আমার একান্ত প্রিয় ব্যক্তি মরহুম **কাজী আশ্রাফ হোসেনের** বড় ছেলে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব **আলহাজ কাজী লিয়াকত হোসেনের** জ্যোষ্ঠ কন্যা **সুলতানা পারভীন হীরা**– ওদের দুই সন্তান ❒ মাহ্‌দী হোসাইন সাঈদী ❒ মানাযির মাহির সাঈদী।

➡ সেজ পুত্র বধূঃ **আলহাজ মাসউদ সাঈদীর** স্ত্রী– আমার পরম বন্ধু আন্তর্জাতিক আলেমে দ্বীন **অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরীর** কন্যা **মাওলানা সাইয়্যেদা মারজানা জাবীন জাফরী**, ওদের এক সন্তান ❒ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সাঈদী।

➡ কনিষ্ঠ পুত্র বধূঃ **নাসীম সাঈদীর** স্ত্রী– জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক এমপি, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জনাব মরহুম **মাষ্টার শফিকুল্লাহ্ সাহেবের** জ্যোষ্ঠ পুত্র জনাব **আলহাজ মোয়াজ্জেম হোসেনের** কন্যা **ফাতেমা রেজায়ী সাজেদা,** সে ঢাকার একটি কলেজে এ্যকাউন্টেন্সীতে অনার্স করছে। আল হাম্‌দু লিল্লাহ্– এরা সকলেই দ্বীনি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ–

আকাশমন্ডলী ও যমীনের সমুদয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে চান তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন। যাকে চান তাকে পুত্র-কন্যা উভয়টাই দান করেন, আবার যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি বেশী জানেন, ক্ষমতাও তিনি বেশী রাখেন। (সূরা আশ্ শূরা-৪৯-৫০)

ফিরে আসি মক্কায় প্রবাসী রুমা প্রসঙ্গে। ওর তিন সন্তান আমাকে এমনভাবে 'নানা-নানা' বলে সম্বোধন করে যে, নিজের অজান্তেই কখন যে ওরা তিনজন আমার একান্ত আপনজনদের মধ্যে শামিল হয়েছে, আমি বুঝতেই পারিনি। পবিত্র মক্কা নগরীর মাটিতে ওরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এখানের পরিবেশে বড় হচ্ছে। পিতা বা মাতার সাথে মসজিদুল হারামে এসে নামাজ আদায়ের সুযোগ পাচ্ছে। আরবীয় শিশুরাই ওদের খেলার সাথী। ফলে ওরা মাতৃভাষা বাংলার তুলনায় আরবী ভাষা অধিক যোগ্যতার সাথে বলতে পারে।

তবে আমি মনে করি, এখানে স্বপরিবারে বাংলাদেশী যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেকেরই উচিত, নিজ সন্তান-সন্ততিকে মাতৃভাষা বাংলা ভালোভাবে শিখানো। নিজের দেশ সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং দেশে যাবার সময় সন্তান-সন্ততিকে সাথে

করে নিয়ে যাওয়া। কোনো দেশেরই **'দেশপ্রেম শূন্য'** নাগরিকের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং নিজের দেশ সম্পর্কে জানলে, দেশ দেখলে নিজ দেশের প্রতি মমত্ব ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবে এবং দেশকে ভালোবাসতে শিখবে।

মক্কা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে আমার আসার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। মসজিদুল হারামের আশেপাশে যে সকল বাংলাদেশী ব্যবসায়ী রয়েছেন, এ সময়টা সাধারণত তাঁরা অবসরেই কাটান। কারণ তাদের ব্যবসার মূল সময় হলো হজ্জ ও রমজানের সময়। সে সময় তাঁরা এতই ব্যস্ত থাকেন যে, কেউ কারো সাথে দেখা করার সময়ও পান না। হজ্জের পরে এখন চলছে তাদের অবসর সময়। ফলে তাঁরা আমাকে সঙ্গ দিতে পারছেন। অনেকেই দাবী জানালেন, তাঁরা খাবার সরবরাহ করবেন। অনেকে আবার না বলেই খাবার এনে হাজির হচ্ছেন। আমি মোস্তফাকে খাবার আনার ব্যাপারে নিষেধ করতে বাধ্য হলাম। রুমাও ইতোমধ্যে দুই বার ছেলেমেয়েদের সাথে নিয়ে এসে আমার সাথে দেখা করে গেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থে উল্লেখ করা প্রয়োজনবোধ করছি যে, প্রতি বছর পবিত্র কা'বা শরীফে এলে যারা আমার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকেন তাদের মধ্যে **হাফেজ নাসির, সাহাবউদ্দিন, শাহ্ আলম, মুজিব, হাফেজ ইদ্রিস, নুরুচ্ছাফা, হাসান নূর, আখতার, হাফেজ ইউসুফ, আইয়ুব যুবায়ের, মাওলানা যাকির, শাওকত, বুরহান, মাওলানা হারুন খান, মুস্তাকসহ** আরো অনেকে।

বিশেষ করে **হাফেজ নাসির** পবিত্র মক্কায় বিগত বিশ বাইশ বছর যাবৎ অবস্থান করছে। সে আমাকে **'আব্বা'** বলে সম্বোধন করে এবং পবিত্র মক্কায় আমি এলে আমাকে সে অনুক্ষণ ছায়ার মতোই অনুসরণ করে।

রমজান মাসে দিবারাত্রি অহর্নিশি অগণিত মানুষের ভীড় অতিক্রম করে পবিত্র কা'বা শরীফের একান্ত সান্নিধ্যে যাওয়া চরম সাধনার ব্যাপার। কিন্তু আমার মন চায় আমি যে কয়টি দিন পবিত্র কা'বা এই চর্মচোখে দেখতে পাচ্ছি, সে কয়টি দিন বায়তুল্লাহ্‌র একান্ত সান্নিধ্যে পবিত্র কা'বা শরীফের সম্মানিত ইমামের পিছনেই নামাজ আদায় করি। কিন্তু অগণিত মানুষের ভীড় অতিক্রম করে যাবো কি করে! আমার স্নেহের হাফেজ নাসির বেশ কষ্ট করে হলেও সে ব্যবস্থাও করে থাকে। সম্মানিত ইমামের পিছনেই একেবারে কাছাকাছি জায়গায় সে আমার নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করে। এ ছাড়াও সে আমার বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। বিগত পনের বছর ধরে রমজান মাসে হাফেজ নাসির মসজিদুল হারামে আমার একান্ত সাথী। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর এ সকল বান্দাকেই সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।

পবিত্র কা'বা শরীফের ছায়াতলে

এবারে পবিত্র কা'বা শরীফে এসে যে মহাসুযোগ লাভ করেছি, ইতোপূর্বে এমন সুযোগ পেয়েছি বলে স্মরণ করতে পারছি না। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রমজান এবং হজ্জের পরে তেমন ভীড় থাকে না। কা'বা শরীফে প্রত্যেক ওয়াক্তে প্রথম কাতারে নামাজ আদায়ের সুযোগ পেয়েছি। ভীড় না থাকার কারণে যত বার আমি বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করেছি, প্রায় তত বারই হাজ্‌রে আসওয়াদে চুমো দিতে পেরেছি। বিশেষ করে মুলতাজিম অর্থাৎ বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার কাছে সহজেই যেতে পেরেছি। দোয়া কবুলের স্থানসমূহের মধ্যে এই স্থানের গুরুত্ব সর্বাধিক। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, **'আমি এখানে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর কাছে যা কিছু প্রার্থনা করেছি, তিনি তা কবুল করেছেন'**।

হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) বলেছেন, পবিত্র মক্কার ১৫টি স্থানে দোয়া কবুল করা হয়। সে ১৫টি স্থান হলো, মাতাফ, মুলতাজিম, মীযাবের নীচে, কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে, সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে, সা'ঈ করার সময়, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে, রুকনে ইয়ামানীর কাছে, আরাফাতে, মুযদালিফায়, মিনায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার স্থানে এবং হাজরে আসওয়াদের কাছে।

আটদিন পবিত্র কা'বা শরীফের ছায়াতলে অবস্থান করার সময় বারবার তাওয়াফ করেছি। এখানে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীরাও আমার সাথে তাওয়াফ করেছেন। তাওয়াফ শেষ করে আমি সাধারণত মসজিদুল হারামের এমন স্থানে বসি, যেখান থেকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ ভালোভাবে দেখা যায়। উপস্থিত বাংলাদেশের নাগরিকগণও আমাকে কেন্দ্র করে বসেছেন। তাঁরা বারবার দেশের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চেয়েছেন। বিশেষ করে ১১ই জানুয়ারী ২০০৭-এ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরের অবস্থা জানতে সকলেই উদগ্রীব। আমি লক্ষ্য করেছি, প্রবাসে থাকলেও বাংলাদেশের নাগরিকগণের অন্তরে দেশপ্রেমের চেতনা খুবই শানিত। আমি তাদের সাথে কথা বলছি এবং মাঝে মধ্যেই বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকিয়ে দেখছি।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, পবিত্র কা'বা শরীফের দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকালেও সওয়াব হয়। হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কা'বা শরীফের প্রতি দৃষ্টি দেয়া একটি ইবাদাত।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'পবিত্র কা'বা শরীফের প্রতি প্রত্যেক দিন-রাতে ১২০টি রহমত নাযিল হয়। এর মধ্যে যে

ব্যক্তি কা'বা ঘর তাওয়াফ করবে তার প্রতি ৬০টি, মসজিদুল হারামে যে ব্যক্তি ইতেকাফ করবে তার জন্যে ৪০টি আর যে ব্যক্তি কা'বাঘরের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে তার প্রতি ২০টি রহমত নাযিল হয়।'

এই পবিত্র কা'বাঘর বারবার দেখেও অতৃপ্তি রয়ে যায়। বারবার দেখার জন্যে নিজের অজান্তেই দৃষ্টি চলে যায় আল্লাহর ঘরের দিকে। এই ঘরের কাছ থেকে যখন দূরে চলে আসি, তখন বুকের ভেতরটা যেনো শূন্য হয়ে যায়। সমস্ত বুকটা জুড়ে পরম প্রিয় কিছু হারানোর ব্যথা হাহাকার করে ওঠে। সারা পৃথিবীটাই নিজের কাছে শূন্য মনে হয়। দেশে ফিরে এসে কয়েক দিন কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারি না। এখানে নামাজ আদায় করছি, সম্মুখে রয়েছে মহাপবিত্র কা'বা শরীফ। সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠালেই চোখের সম্মুখে কা'বাকে দেখি। কিন্তু এখান থেকে দূরে-বহুদূরে নিজ দেশে সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠালে কা'বাকে আর দেখা যায় না। মন ছুটে চলে আসে পবিত্র কা'বায়।

মহান আল্লাহর অসীম রহমত, কা'বার অঙ্গনে আমি বসে থাকলে প্রবাসী বাংলাদেশীরাও আমার কাছে বসেন। দূর থেকে দেখলে মনে হবে ছোটো-খাটো একটি সমাবেশ। আতিথেয়তার জন্যে সেই সুদূর অতীত থেকেই আরবীয়রা সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত। এতগুলো লোকজন আল্লাহর ঘরের সামনে বসে রয়েছে, এই দৃশ্য দেখার সাথে সাথে সাউদী কোনো নাগরিক প্যাকেট জাত খেজুর এনে সালাম জানিয়ে বলেন, **'নিজে খাও এবং সাথীদেরকে খেতে দাও'**। খেজুর খেতে খেতে উপস্থিত সকলের সাথে কথা চলতে থাকে।

এবারে আমার জন্যে সবথেকে প্রশান্তির বিষয় হলো, প্রায় প্রতি ওয়াক্ত নামাজ প্রথম কাতারে আদায় করতে পেরেছি, বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজায় অর্থাৎ মুলতাজিমে আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দিতে পেরেছি। সেই সুদূর কিশোর বয়স থেকেই আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার জন্যে এমন এক পরিবেশ দান করেছিলেন যে, কখনো তিনি আমাকে নীরব রাখেননি। প্রায় প্রত্যেক দিনই কোরআনের কথা বলার জন্যে তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহর দ্বীনের কথা বলার অপরাধে (?) ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ সরকার যখন আমাকে কারাবন্দী করলো, তখনও আল্লাহ্ তা'য়ালা কারাঅভ্যন্তরেও আমার কণ্ঠ নীরব রাখেননি।

কারাগারে প্রবেশ করার পরপরই জেলার সাহেব এসে আমাকে বললেন, 'আমি এখানে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করবো, আপনি কোরআন-হাদীস থেকে

বক্তব্য রাখবেন।' আমি কারাগারে বন্দীদের উদ্দেশ্যে কোরআন থেকে কথা শুনাতাম। কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পরে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নানা ধরণের প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও আমি কোরআনের কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু ২০০৭-এর ১১ই জানুয়ারী থেকে দেশে জরুরী আইন থাকার কারণে কোরআনের কথা বলার ক্ষেত্রেও আমার প্রতি অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো।

আমি কোরআনের কথা বলতে পারবো না! এ কথা আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। প্রচন্ড যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচ্ড়ে উঠলো। দেশে থাকতে খুব কষ্টে কান্না রোধ করতে হয়েছে। কিন্তু মহান মালিক আমার আল্লাহর ঘর মহাপবিত্র কা'বা শরীফের দরজার সম্মুখে পৌঁছে নিজেকে আর রোধ করতে পারিনি। বুকের ভেতর থেকে তোলপাড় করে উঠে আসা অদম্য কান্না বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতোই বেরিয়ে এসেছে। অভিমানী শিশু যেমন পিতামাতাকে কাছে পেলে কান্না দমন করতে পারে না, আমার অবস্থাও হলো তেমনি।

আল্লাহর ঘর– মহাপবিত্র কা'বার দরজার সম্মুখে আমি, এখানে কাঁদবো না তো কাঁদবো কোথায়! মানুষকে বলার অনুপযোগী কথা, মানুষের কাছে নিবেদনের অনুপযোগী বিষয় এবং মানুষের কাছে প্রকাশের অনুপযোগী কথাগুলোই তো আমি আমার আল্লাহর কাছে প্রকাশ করবো। যিনি ইচ্ছে করলে সকল সমস্যার সমাধান মুহূর্তের মধ্যেই করে দিতে পারেন। নিজের দেশ, জাতি, মুসলিম উম্মাহ্ এবং সমগ্র মানুষের কল্যাণ চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে মনের আকুতি নিবেদন করলাম। বুকের মধ্যে মর্মযন্ত্রণার জমাট বাঁধা বরফ অশ্রু হয়ে ঝরে পড়লো পবিত্র কা'বার গায়ে। কাঁন্নায় মন হালকা হয়, মনের যন্ত্রণা লাঘব হয়। মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কাঁদতে পেরে নিজেকে বেশ হালকা অনুভব করলাম। যে কয়দিন কা'বার ছায়াতলে অবস্থান করেছি, প্রত্যেক দিনই আমার মনের চাওয়া ও মর্মযন্ত্রণাগুলো আল্লাহর কাছে নিবেদন করেছি।

পবিত্র কোরআনের তাফসীর মাহফিল যাদের ইন্ধনে বন্ধ হলো, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের শুভবুদ্ধির উদয় করুন। তবে আমি বিশ্বাস করি, সকল কিছুর পেছনেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের জন্যে কল্যাণ রাখেন। এই কল্যাণ কত দূরে, তা আমরা দেখতে পাই না। এবারে কোরআনের কথা শোনা থেকে আমার জাতি বঞ্চিত হলো, অবশ্যই এর পেছনে কল্যাণ রয়েছে।

মানসিক প্রশান্তির দিনগুলো দ্রুত ফুরিয়ে যায়– মক্কায় অবস্থানের আটটি দিন কিভাবে কখন যে ফুরিয়ে গেলো, এত দ্রুত সময় পার হয়ে গেলো মনে হলো যেনো, এই মাত্র তো কা'বার সান্নিধ্যে এলাম!

ইচ্ছে না থাকলেও পবিত্র কা'বা শরীফকে বিদায় জানানোর দিন ঘনিয়ে এলো। এবারে সাউদী আরবে আসার সময় অনেকগুলো কর্মসূচী নিয়ে আসতে হয়েছে। এখান থেকে যেতে হবে মদীনায়, তারপর আলউলা প্রদেশে, ওখান থেকে পুনরায় মদীনায় এবং মদীনা থেকে সাউদী আরবের রাজধানী শহর রিয়াদে।

মক্কা থেকে মদীনার পথে- রাসূলের দেশে

আজ ১৭ই মার্চ, মদীনা থেকে স্নেহাষ্পদ **রফিকুল ইসলাম** ও **হাফেজ আব্দুস সালাম** গাড়ি নিয়ে মক্কায় আমার কাছে উপস্থিত হলো। বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার অধিবাসী **রফিকুল ইসলাম** মদীনায় সপরিবারে প্রবাসী। আমার জন্মভূমি বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার শর্ষিনার অধিবাসী একান্ত পুত্রতুল্য **হাফেজ আব্দুস সালামও** সপরিবারে মদীনায় প্রবাসী ব্যবসায়ী। **হাফেজ আব্দুস সালামের** সন্তান-সন্ততি তিনজন। বড় মেয়ে **দিলুরুবা,** তারপর ছেলে **আহ্মাদ** এবং মেয়ে **মারীয়া**। মদীনাতে গেলে **হাফেজ আব্দুস সালামের** বাসাতে আমাকে যেতেই হয়, কারণ ওর বাচ্চাগুলো আমাকে চম্বুকের মতোই আকর্ষণ করে। ওর স্ত্রী বেগম **আজমা সুলতানা** শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে বিএবিএড এবং মদীনায় একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়ত্রীর দায়িত্ব পালন করে।

মক্কার মতো মদীনাতেও আমার কাছে খাবার সরবরাহের সেই একই অবস্থা হয়। প্রতি বছর মদীনা মুনাওয়ারায় আমার থাকা-খাওয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন চট্টগ্রামের **বায়তুশ শরফের পীর হযরত মাওলানা মরহুম শাহ্ আব্দুল জব্বার (রাহঃ)**-এর সুযোগ্য জামাতা **মুরতাজা সিদ্দিকী, হাফেজ আব্দুস সালাম, হাফেজ আব্দুল হালীম, ডক্টর সাইফুল ইসলাম, ডাক্তার আনীসুল করীম, মুহাম্মাদ ইউনুস, আবুল কাসেম, হাফেজ মাওলানা জাহিদ, রফিকুল ইসলামসহ** আরো অনেকে।

বিশেষ করে **হাফেজ আব্দুস সালাম** তার ছাত্র জীবন থেকেই আমার পরিবারের সাথে পুত্রতুল্য সম্পর্ক বজায় রেখে আসছে, এ কারণে প্রতি বছর সাউদী আরবে প্রবেশ করা থেকে বিদায় নেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে কেন্দ্র করেই তার সকল ব্যস্ততা আবর্তিত হয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এদের সকলকেই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন।

বিদায়ী তাওয়াফ পূর্বেই করেছিলাম। এখন প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজগুলো দ্রুত সেরে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি ছুটে চললো মদীনার পথে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পরম প্রিয় হাবীব, আমার জীবনের চাইতেও প্রিয় নবী করীম (সাঃ)-এর দেশে। গাড়ি রাসূলের দেশের দিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু আমার মন অনেক পূর্বেই মসজিদে নববীতে পরম প্রিয়জন যেখানে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। মদীনাকে নবী করীম (সাঃ) বড়ই ভালোবাসতেন। তিনি মদীনার প্রত্যেক জিনিসে বরকতের জন্যে দোয়া করতেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! তুমি মক্কাতে যে বরকত দান করেছো মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করো।' হযরত আনাস (রাঃ) আরো বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) যখন সফর থেকে ফিরার পথে মদীনার প্রাচীরের দিকে তাকাতেন তখন মদীনার প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি উট দ্রুত চালনা করতেন। আর অন্য কোনো জন্তুর ওপর থাকলে তাকে দ্রুত চলার জন্য আন্দোলিত করতেন।' হযরত উমার (রাঃ) দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত (শহীদ হওয়া) এবং তোমার রাসূলের শহরে (মদীনায়) মৃত্যু দান করো।' (বোখারী)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) মদীনার একটি নির্দিষ্ট সীমা উল্লেখ করে বলেছেন, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত হারাম (মহাসম্মানিত) এলাকা। এখানের বৃক্ষ কাটা যাবে না। এখানে ইসলামের বিপরীত কোনো কাজ করা যাবে না। যে ব্যক্তি এখানে এধরণের বিদআত করবে তার প্রতি আল্লাহর সকল ফিরিশতা ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।' হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মদীনার দুই কঙ্করময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে আমার কথা দ্বারা হারাম (মর্যাদাবান) করা হয়েছে। এখানে যদি কেউ অসংগত নতুন কিছু (বিদআত) করে বা বিদআত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় তবে তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফিরিশতা ও মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।' (বোখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি এমন একটি জনপদে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যা সকল জনপদের ওপর বিজয়ী হবে। লোকজন একে ইয়াসরিব বলে থাকে। অথচ এর উপযুক্ত নাম হলো মদীনা। এই মদীনা খারাপ লোকদেরকে এর অভ্যন্তর থেকে এমনিভাবে দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।' হযরত জাবের (রাঃ) বলেছেন, 'নবী

করীম (সাঃ) বলেছেন, মদীনা লোহা দগ্ধ করা হাপরের মত যা ময়লা আবর্জনা দূরীভূত করে এবং খাঁটি বা নির্ভেজালকে ধরে রাখে।' হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, আমরা আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর সাথে তাবুক থেকে ফিরে এসে মদীনার কাছাকাছি হলে তিনি বললেন, এই তো তাবাহ (তাবাহ অর্থ তাইয়েবা বা পবিত্র)।' (বোখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলতেন, 'আমি যদি মদীনাতে হরিণ চরে বেড়াতে দেখি তাহলে তাকে ভয় দেখাবো না। কারণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, মদীনার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হারাম।' হযরত সাদ (রাঃ) বলেছেন, 'আমি আল্লাহর নবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কেউ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করলে সে এমনভাবে বিগলিত হয়ে যাবে লবণ যেমন বিগলিত হয়ে যায়।' হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ঈমান শেষ পর্যন্ত এমনভাবে মদীনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।' হযরত আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, মসীহে দাজ্জালের ভীতি ও ত্রাস মদীনাতে প্রবেশ করবে না। ঐ সময় মদীনার সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে এবং প্রত্যেক প্রবেশ পথে দুইজন করে ফিরিশতা (পাহারায়) থাকবে।' হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, মদীনার প্রবেশ পথসমূহে ফিরিশতারা পাহারায় থাকে। সেখানে মহামারী বা দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।' (বোখারী)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, মক্কা ও মদীনা ছাড়া এমন শহর (বা জনপদ) নেই যা দাজ্জাল পদদলিত করবে না। মক্কা এবং মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফিরিশতারা সারিবদ্ধ হয়ে পাহারারত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিন বার প্রকম্পিত (ভূমিকম্প) হবে। আর এভাবে আল্লাহ সেখান থেকে সকল কাফির ও মুনাফিকদের বের করে দিবেন।' (বোখারী)

এই হলো মদীনা– সোনার মদীনা। মদীনা নামটি মুমিনের কানে পৌঁছামাত্র অন্তরে নবী করীম (সাঃ)-এর মহব্বত তোলপাড় করে ওঠে। পবিত্র মক্কার পরেই মদীনার সম্মান মর্যাদা। মক্কায় রয়েছে মুসলমানদের মহামিলন কেন্দ্র, তাওহীদের চির অনির্বাণ প্রদীপ মহাপবিত্র কা'বা শরীফ। আর মদীনায় রয়েছে বিশ্বনবী, দুনিয়া আখিরাতে মুক্তির একমাত্র কান্ডারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববী, প্রিয় হাবীবের পবিত্র কবর, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও পবিত্র পরিবার পরিজনের কবর।

সাউদী সরকার মক্কা থেকে মদীনায় সহজে পৌছার জন্যে পাহাড় কেটে কঙ্করময় ভূমি সমতল করে সিল্কের মতো মসৃণ সড়ক নির্মাণসহ কোথাও বা ফ্লাই ওভার নির্মাণ করেছেন। পথের দুই পাশেই সারি সারি নানা রঙের পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেদিকেই দৃষ্টি চলে সেদিকেই পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে মধ্যে কঙ্করময় ভূমিও রয়েছে। এসব ভূমিতে সাধারণত ক্যাকটাস জাতিয় কাঁটাযুক্ত বিশেষ ধরণের গাছ জন্মে। এসব গাছ উটের প্রিয় খাদ্য। পাহাড়ের পাদদেশে সাউদী সরকারের পশু সম্পদ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় বড় বড় পানির হাউজ নির্মাণ করে দিয়েছে। পাহাড়ী এলাকার উটের পান করার জন্যে সরকারীভাবে প্রত্যেক দিন এসব হাউজ পানি দিয়ে পূর্ণ করা হয়। এসব পানির হাউজ থেকে শুধুমাত্র উটই পানি পান করে না, অন্যান্য পশু-পাখিও পানি করে। নিঃসন্দেহে এটা অনেক বড় সওয়াবের কাজ।

বাতাস কেটে শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলে তীব্রবেগে গাড়ি ছুটে চলেছে মদীনার দিকে। রফিকুলের নিজের গাড়ি, সে নিজেই ড্রাইভ করছে। লক্ষ্য করলাম, গাড়ি চালনায় সে ভালোই হাত পাকিয়েছে। মহান আল্লাহর রহমতে আসরের নামাজের পূর্বেই ৪৬০ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে প্রিয় রাসূলের দেশ মদীনায় পৌছালাম।

আমার জীবনের চাইতেও প্রিয় পরম প্রিয়জনের পাশে

মদীনায় মসজিদে নববীর খুবই কাছে হোটেল 'ডানাটা'য় পূর্বেই আমার জন্যে বুকিং দেয়া ছিলো। আমার জন্যে নির্ধারিত কক্ষে গিয়ে দেশ থেকে নিয়ে আসা আমার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস-পত্র রেখে অজু করে মসজিদে নববীর দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্রিয় রাসূল– আমার রাসূল, সমগ্র সৃষ্টি জগতের রাসূল। দেশ বিদেশে যেখানেই থাকি না কেনো, অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে থাকলেও প্রিয় রাসূলের কথা আমার মনের গহীনে অনুরণিত হতে থাকে। আমার সেই পরম প্রিয়জন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে নির্মিত মসজিদে নববী আমার চোখের সম্মুখে। সেই মসজিদেরই এক কোণে তিনি দুই সাথীসহ জান্নাতী পরিবেশে ঘুমিয়ে রয়েছেন। এই মসজিদ নির্মাণের সময় নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের গায়ের ঘাম পা পর্যন্ত পৌছেছে।

মদীনায় এসে তিনি যখন এই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন এই ভূমিখন্ডের অধিকারী ছিলো বনী নাজ্জার গোত্র। নবী করীম (সাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন বনী নাজ্জার গোত্রের একজন। রাসূল (সাঃ) শিশু বয়সে

যখন গর্ভধারিণী মায়ের সাথে মদীনায় এসেছিলেন, তখন প্রায় এক মাস এই বনী নাজ্জার গোত্রেই অবস্থান করতেন। বনী নাজ্জার গোত্রের শিশু-কিশোরদের সাথে তিনি মদীনার সরোবরে সাঁতার শিখেছিলেন। হযরত আমিনা প্রিয় সন্তান শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে তাঁর কখনো না দেখা পিতার কবরও মদীনায় দেখিয়েছিলেন। হিজরত করার পরে তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে সেই শিশু বয়সে মদীনায় আসার স্মৃতি চারণ করতেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) মদীনায় আসার পর মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে বনী নাজ্জার! আমার কাছ থেকে ভূমির মূল্য গ্রহণ করো। তারা বললো, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো কাছে এর মূল্য চাই না। তখন আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হলো, ভগ্নাবশেষ পরিষ্কার করে ভূমি সমতল করা হলো এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো। মসজিদের কিবলার দিকে কেবল কিছু খেজুর গাছ সারিবদ্ধভাবে রাখা হলো। (বোখারী)

মাটি, পাথর, কাদা আর খেজুর গাছের কান্ড দিয়ে নির্মিত সেই মসজিদ একের পর এক সম্প্রসারিত হয়েছে। আল্লাহভীরু শাসকগণ মসজিদ সম্প্রসারিত করার সাথে সাথে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। অসংখ্য অগণিত লোকজন একত্রে জামায়াতে নামাজ আদায় করতে পারে সে ব্যবস্থাও করেছেন। অগণিত বাথরুম, টয়লেট ও অজুখানা নির্মাণ করেছেন। মসজিদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ অবস্থান করে, সকলের শ্বাস-নিঃশ্বাসে মসজিদের অভ্যন্তরের পরিবেশ যেনো ভারী হয়ে না ওঠে, এ জন্যে মসজিদের উচ্চতা বৃদ্ধি করেছেন। ছাদের ওপর যেসব গম্বুজ বানানো হয়েছে তা চলমান করা হয়েছে। বিশেষ সুইচে চাপ দিলেই এসব গম্বুজ এক স্থান থেকে সরে আরেক স্থানে চলে গেলে উন্মুক্ত আকাশ দেখা যায়। এ সময় মানুষের ছেড়ে দেয়া কার্বন ড্রাই অক্সাইড আকাশের দিকে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়।

পবিত্র রওজা মোবারকের উত্তর দিকে মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে মূল্যবান পদার্থ দিয়ে প্রস্তুত করা ছাতার কাপড়ের মতো আবরণ বানিয়ে বিশাল আকৃতির ছাতা বানানো হয়েছে। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় এই ছাতা বন্ধ করা ও খোলা হচ্ছে। পানির পিপাসা মিটানোর জন্যে নামাজের কাতারসমূহের পাশ দিয়ে জমজমের ঠান্ডা ও স্বাভাবিক পানি ভর্তি কন্টেইনার রাখা হয়েছে। কন্টেইনারের ডান পাশে রয়েছে অব্যবহৃত গ্লাস, বাম পাশে রয়েছে ব্যবহৃত গ্লাস রাখার ব্যবস্থা। বিশেষ পদার্থে নির্মিত এসব গ্লাস একজনের একবারই ব্যবহারের জন্যে, দুইজনের ব্যবহারের জন্যে নয়।

মসজিদে নববীর সহস্র সহস্র খাদেম সবদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। কোনো কন্টেইনারের পানি ফুরিয়ে গেলে বা ব্যবহৃত পাত্রের স্তুপ জমে গেলে অথবা গ্লাস ফুরিয়ে গেলে দ্রুত তাঁরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। লক্ষ মানুষের মধ্যে হঠাৎ কেউ অসুস্থতা অনুভব করলে দ্রুত তাকে নিয়ে চিকিৎসা দেয়ার জন্যে এ্যাম্বুলেন্স ও স্ট্রেচারের ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদে নববীর প্রত্যেক পিলারের গোড়ায় পিতলের নেট বসানো রয়েছে। প্রায় তিন মাইল দূর থেকে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত করা হচ্ছে, যে ঠান্ডা বাতাস পিতলের নেট দিয়ে বেরিয়ে এসে ভিতরের পরিবেশ আরামদায়ক করে দিচ্ছে।

এক কথায় মানুষের প্রত্যেক দিকের সুযোগ-সুবিধার প্রতি সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সাউদী সরকার। ঠিক এ কারণেই সরকার প্রধানকে বলা হয়, **'খাদেমুল হারামাইনিশ্ শারিফাইন'** অর্থাৎ উভয় হারাম শরীফের খাদেম।

নবী করীম (সাঃ)-এর কথা স্মরণে আসার সাথে সাথেই আমার চোখ দুটো ভারী হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরটা প্রিয়জনকে না দেখতে পাওয়া মর্মবেদনা করুণ স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু মুখে তো প্রকাশ করতে পারি না। যতই বেদনা-বিধুর পরিবেশ মনকে আচ্ছন্ন করুক না কেনো, এখানে এই পরিবেশে শব্দ করে কাঁদা যাবে না। নবী করীম (সাঃ) প্রিয় সাথীদের নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন, এখানে কি উচ্চ শব্দে কাঁদা যায়! এখানে যে পরিবেশ বিরাজ করে, তা চোখে না দেখলে ভাষার তুলিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

গত কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে থাকাকালে **আব্দুস সালাম মিতুল** আমাকে একটি বই দিলো। বইটির নাম **'প্রিয় রাসূল (সাঃ) দেখতে কেমন ছিলেন'** এবং বইটির লেখিকা মক্কা প্রবাসী স্নেহাস্পদ মোস্তফার স্ত্রী **উম্মে হাবীবা রুমা**। রুমার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এবারে মক্কায় অবস্থানকালে কিভাবে সে রান্না করে আমার জন্যে খাবার পাঠাতো। রুমা সময়-সুযোগ পেলেই মদীনায় আসে।

রুমা লিখেছে, 'মদীনার প্রশস্ত ও গলি পথ, পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণা, প্রান্তর, উর্বর ভূমি, বৃক্ষ, তরুলতা, পায়ের নীচের ঘাসসহ সবকিছুই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের স্মৃতি ধারণ করে রয়েছে। সর্বত্রই এক সময় এসব স্থান আল্লাহর নবী আর সাহাবায়ে কেরামের পদচারণায় স্পন্দিত হতো। এখন আর তাঁদের পবিত্র পদচারণা শোনা যায় না, সবকিছুতেই সীমাহীন নীরবতা। এখানে বাতাসে শুধু ভেসে বেড়ায়

মুমিনের নীরব কান্না। সতর্কতার সাথে নিজের কানকে সজাগ না করলে সে কান্নাও শোনা যায় না। কেউ-ই এখানে শব্দ করে কাঁদেন না। শব্দ করে কাঁদলে যদি আল্লাহর রাসূলের সাথে বেয়াদবি হয়ে যায়!

আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআনে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, **'আমার রাসূলের সামনে কণ্ঠ উঁচু করো না।'** কোরআনের এই আয়াতটি রাসূল (সাঃ)-এর রওজা মোবারকের সম্মুখেই উৎকীর্ণ করা রয়েছে। সুতরাং এখানে কেউ-ই কোনো রূপ শব্দ করেন না। প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর রওজা মোবারকের সামনে কোনো মুমিন যাবে আর তাঁর চোখ শুক্‌নো থাকবে অথবা বুকের মধ্য থেকে বোবা কান্না তোলপাড় করে কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসতে চাইবে না, এমনটি কখনো হতে পারে না। তবুও আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধের কারণে কেউ-ই শব্দ করে কাঁদেন না। নীরবে শুধু চোখের পানি ঝরে বুক ভিজিয়ে দেয়। কারণ পৃথিবীতে অবস্থানকালে আল্লাহর হাবীবের যে সম্মান-মর্যাদা ছিলো, ইন্তেকালের পরও তাঁর সেই সম্মান-মর্যাদাই রয়েছে। সুতরাং তাঁর প্রতি কোনো ধরণের বেয়াদবি হয়, এমন আচরণ করা হারাম।' (প্রিয় রাসূল (সাঃ) দেখতে কেমন ছিলেন, পৃষ্ঠা নং-২১-২২)

পরম আকাংখিত স্থান রিয়াজুল জান্নাত

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি। আর আমার মিম্বার আমার হাউযের ওপরে অবস্থিত। (বোখারী)

এই হাদীসটি নবী করীম (সাঃ)-এর মিম্বারের বাম পাশে রিয়াজুল জান্নাতের প্রবেশ পথের ওপরে উৎকীর্ণ করা রয়েছে। এই স্থানে দোয়া কবুল করা হয় এবং এখানে প্রবেশ করে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করতে হয়। আল্লাহ তা'য়ালা এবারে আমাকে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ জামায়াতের সাথে এখানেই আদায় করার অপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

মদীনা থেকে কিবলা দক্ষিণ দিকে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন–

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَه–

তোমরা এই মর্যাদাসম্পন্ন মাসজিদের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে থাকবে, তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো তোমাদের মুখমন্ডল সেদিকেই ফিরিয়ে দিবে। (সূরা বাকারাহ্-১৪৪)

মহান আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করার কারণে মসজিদে নববীতে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ মুখমন্ডল কিবলার দিকে ফিরিয়ে নামাজ আদায় করতে হয়। নবী করীম (সাঃ) যখন মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তখন সে মসজিদ ছিলো বর্তমানের তুলনায় আকারে বেশ ছোটো। মসজিদের পূর্বপাশেই অনতিদূরে জান্নাতুল বাকী নামক বিশাল কবরস্থান। অগণিত সাহাবায়ে কেরাম ও নবী পরিবারের সদস্যগণ এখানে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।

জান্নাতুল বাকী এবং মসজিদের নববীর মাঝের স্থানে মসজিদের খুবই কাছে সে সময় রাসূল (সাঃ) নিজ স্ত্রীদের বাসস্থান নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। বিশেষ করে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ঘর মসজিদের দেয়াল সংলগ্ন ছিলো। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) মসজিদে অবস্থান করে নিজের মাথা মোবারক বের করে দিতেন, আর হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজ হাতে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র চুল মোবারকে চিরুণী চালাতেন। এতেই বুঝা যায়, তাঁর ঘর মসজিদের কত কাছে ছিলো। অন্যান্য স্ত্রীগণের ঘরও মসজিদের কাছে ছিলো, সেসব ঘরের স্থানসমূহ সম্প্রসারণ করার সময় মসজিদের মধ্যেই শামিল করা হয়েছে।

শুধু রয়ে গেছে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরের স্থানটুকু। কারণ তাঁর ঘরের মধ্যেই ঘুমিয়ে রয়েছেন নবী করীম (সাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ)। এই ঘরের মধ্যে আরেকটি কবরের স্থান রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করার পরে তিনি যখন ইন্তেকাল করবেন, তখন তাঁর কবর হবে এই স্থানে।

নবী করীম (সাঃ)-এর কবর এবং তাঁর যুগে নির্মিত মসজিদের মিম্বার যেখানে ছিলো, এ দুয়ের মাঝের স্থানকেই জান্নাতের একটি টুকরা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে যুগে মসজিদের মিম্বার যে স্থানে ছিলো, এখনো সে স্থানেই রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে স্থানেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (সাঃ) মিম্বারের পাশে যেখানে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেন, সে স্থানও খুব যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তবে তিনি যে স্থানে পবিত্র মাথা মোবারক রেখে মহান আল্লাহকে সিজ্‌দা করতেন, সে স্থান উন্মুক্ত রাখা হয়নি। তিনি যে স্থানে পবিত্র কদম মোবারক রাখতেন

সে স্থান উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তাঁর অগণিত উম্মাত তাঁর পবিত্র কদম মোবারক রাখার স্থানে মাথা রেখে মহান আল্লাহকে সিজ্‌দা দিয়ে থাকে। কবি বলেছেন–

ইয়ে তেরি মিরাজ থিঁ কে তু আরশ তক্ পৌঁহ্‌ছা,

আওর ইয়ে মেরে মিরাজ হ্যায় কে ম্যাঁয় তেরে কদম তক্ পৌঁহ্‌ছা।

এটা আপনার মিরাজ ছিলো যে আপনি আল্লাহর আরশে পৌঁছেছিলেন। আর আমার মিরাজ তো এটাই যে, আমি আপনার কদম পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি।

রিয়াজুল জান্নাতে বসে কোরআন তিলাওয়াত করার সময় মনের জগতে এক ভিন্ন আবেগ-উচ্ছ্বাসের জোয়ার সৃষ্টি হয়। যাঁর প্রতি মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো, সেই মহামানব মাত্র কয়েক ফুট দূরেই জান্নাতী আবেশে শুয়ে রয়েছেন। আর তাঁর পাশেই আমি সেই কোরআন তিলাওয়াত করছি। শুধু আমি নই, আমার মতো অসংখ্য-অগণিত মানুষ এখানে বসে কোরআন তিলাওয়াত করেন।

নবী করীম (সাঃ)-এর উম্মত তাঁরই রওজার পাশে বসে কোরআন তিলাওয়াত করে, তিনি কি উম্মতের কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত শুনতে পান?

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার কোনো উম্মত আমাকে সালাম জানালে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার রুহ্ আমার দিকে ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি। (আবু দাউদ, বায়হাকী, দাওয়াতে কাবীরে)

আরেক হাদীস বলা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার যে উম্মত আমার কবরের কাছে এসে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, আমি তা প্রত্যক্ষভাবে শুনবো, আর যে উম্মত দূরে অবস্থান করে আমার প্রতি দরুদ পড়বে তা আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। (বায়হাকী, শু'আবুল ঈমানে)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার কিছু সংখ্যক ফিরিশ্‌তা রয়েছেন, যারা সারা দুনিয়ায় ঘুরতে থাকেন, আমার যে উম্মাত যেখান থেকেই আমাকে সালাম জানায় তা তাঁরা আমার কাছে পৌঁছে দেন। (নাসাঈ, দারেমী)

এসব হাদীসের আলোকে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে উম্মতের পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত, তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম তাঁকে শোনানোর ব্যবস্থা করেন।

পবিত্র রওজা মোবারক দেখতে কেমন

রিয়াজুল জান্নাতে জায়গা পাওয়া অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ জান্নাতের টুকরা হিসেবে প্রসিদ্ধ এই স্থানে নামাজ আদায়ের লোভ কেউ-ই সংবরণ করতে পারেন না। হজ্জ ও রমজানে রীতিমতো যুদ্ধ করে এই স্থানে বসার জায়গা করতে হয়। মহিলাদের জন্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে এই স্থানটুকু মোটা কাপড় দিয়ে বেশ উঁচু করে ঘিরে দেয়া হয়। কাপড়ের ঘেরা কখন সরিয়ে নেয়া হবে এই অপেক্ষায় অগণিত মানুষ অপেক্ষা করতে থাকে। যখনই তা সরিয়ে নেয়া হয়, তখন অপেক্ষমান মানুষ রিয়াজুল জান্নাতে জায়গা নেয়ার জন্যে একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেকে জায়গা পান আবার অনেকে মনের কষ্ট মনেই গোপন রেখে অন্যত্র বসে সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

আমার পক্ষে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি বা দৌড়াদৌড়ি করে রিয়াজুল জান্নাতে জায়গা পাওয়া সম্ভব ছিলো না। আমি মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি এ জন্যে যে, মদীনা প্রবাসী আমার বাংলাদেশী প্রিয়জনরা নিজেদের অনেক সময় নষ্ট করে প্রত্যেক দিনই পাঁচ বা ছয়জন রিয়াজুল জান্নাতে জায়গা দখল করার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। যখনই ঘেরা দেয়া কাপড় সরিয়ে নেয়া হয়, তখনই তাঁরা দৌড়ে গিয়ে বিশেষ বিশেষ থামের পাশে জায়গা দখল করে বসে থাকেন। এরপর আমি সেখানে পৌঁছালে তাঁরা হাত উঁচু করে আমাকে ইশারা করলে আমি সেখানে গিয়ে বসি- আল হাম্‌দু লিল্লাহ্।

ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরেই নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকাল হয়েছে এবং সে ঘরেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছে। বর্তমানে সে ঘরটি মসজিদে নববীর অভ্যন্তরেই নেয়া হয়েছে। এই ঘরটির ওপরেই রয়েছে সবুজ রঙের গম্বুজ। বাইরে থেকে সবুজ রঙের গম্বুজটি দেখলে বুঝা যায়, নবী করীম (সাঃ) এই গম্বুজের নীচেই শুয়ে রয়েছেন। ভেতরের দিকে ছাদ পর্যন্ত প্রাচীর দেয়া এবং প্রাচীরের কতক স্থানে গ্রীল দেয়া হয়েছে। এই গ্রীলের সম্মুখের কিছু অংশ উন্মুক্ত রেখে পুনরায় প্রায় তিন ফুট উচ্চতাসম্পন্ন স্টীলের গ্রীল দেয়া হয়েছে। স্টীলের এই গ্রীলের ওপাশে উন্মুক্ত স্থানে সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন নিরাপত্তা কর্মীগণ।

রওজা মোবারকের নিরাপত্তার দায়িত্ব যাঁরা পালন করছেন, তাঁরা কেউ-ই সাধারণ লোক নন। এরা সকলেই বড় বড় আলেম এবং পুলিশ কর্মকর্তা। আমাদের দেশে মৃত লোকদের কবরকে কেন্দ্র করে যেসব শির্‌ক-বিদআত হয়, এ ধরণের কোনো

কাজ সেখানে কেউ-ই করতে পারে না। কেউ যদি আবেগ বশতঃ রওজা মোবারক ঘিরে রাখা দেয়াল বা গ্রীল স্পর্শ করে চুমো খেতে চায়, তাহলে সাথে সাথে নিরাপত্তা কর্মীগণ প্রচন্ড বাধার সৃষ্টি করেন।

গ্রীলের ফাঁক দিয়ে ভেতরে শুধু সবুজ কাপড়ের পর্দা দেখা যায়। সবুজ কাপড়ের পর্দার ওপরে পবিত্র কোরআনের আয়াত উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই পর্দাও মেঝে থেকে ওপরে ছাদ পর্যন্ত ঝুলানো রয়েছে। পর্দার আড়ালেই ঘুমিয়ে রয়েছেন বিশ্ব-জাহানের রহমত, দুনিয়া-আখিরাতের মুক্তির একমাত্র কান্ডারী নবী করীম (সাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ)।

সুতরাং তাঁদের কবরসমূহ কোন্ আকৃতির, দেখতে কেমন, মাটি না পাথরে বাঁধানো তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ নবী করীম (সাঃ)-এর রওজা মোবারকের যে কল্পিত ছবি ছাপিয়ে বিক্রি করে থাকে, পবিত্র রওজা মোবারক দেখতে অবশ্যই তেমন নয়। আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কবরকে কেন্দ্র করে যেসব ঘর নির্মাণ করা হয়, সে সকল ঘর নানাভাবে সজ্জিত করা, প্রদীপ জ্বালানো ও সুগন্ধি ছড়ানো হয়। নবী করীম (সাঃ) এসব করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ কারণে তাঁর রওজা মোবারকে এসবের কিছুই নেই, এমনকি ঘরটির মধ্যে রাতে কোনো আলোও জ্বালানো হয় না। মসজিদে নববীর মধ্যে যে ঘরে নবী করীম (সাঃ)-এর কবর, সে ঘরে সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতি নেই। একান্ত প্রয়োজনে সাউদী আরবের বাদশাহ স্বয়ং প্রবেশ করেন।

এবারে রিয়াজুল জান্নাতে অবস্থানের সময় একজন বাংলাদেশী বুযর্গ ব্যক্তির সাথে আলাপ হলো। তিনি মদীনায় মসজিদে নববীর খেদমতে রয়েছেন দীর্ঘ চল্লিশ বছর। তিনি জানালেন, সাউদী আরবের বাদশাহের সাথে বছরের বিশেষ দিনে তিনি এ পর্যন্ত ১১ বার উক্ত ঘরে প্রবেশ করেছেন। পবিত্র কবরসমূহের চারদিকে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত যে সবুজ কাপড়ের পর্দা টানানো রয়েছে, সাউদী বাদশাহ প্রত্যেক বছরে একবার উক্ত পর্দা পরিবর্তন করে দেন। তিনি স্বয়ং নিজ হাতে পবিত্র কবরসমূহ পরিষ্কার করেন।

আমি উক্ত বুযর্গ লোকটির কাছে ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানালেন, বাদশাহ যখন দরজা নিজ হাতে খুলে ভিতরে প্রবেশের উদ্যোগ নেন, তখন থেকেই তাঁর চেহারা ভয়ে-আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে যায় এবং সারা দেহে কম্পন শুরু হয়। বাদশাহর চোখ থেকে অঝোর ধারায় শুধু পানি ঝরতে থাকে। তাঁর সহযোগী হিসেবে আমরা যারা উপস্থিত থাকি তাদের অবস্থাও একই রকম হয়।

নতুন পর্দা টানানোর জন্যে বাদশাহ নিজ হাতে যখন পুরনো পর্দা খুলেন, তখনই এমন সুঘ্রাণ সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে যে, এই সুঘ্রাণ পৃথিবীর কোনো সুগন্ধির মতো নয়। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর দুই প্রিয় সাথীর কবর থেকে সুঘ্রাণ বের হতে থাকে। কবরসমূহ চারদিক থেকে মূল্যবান পাথরে পরিবেষ্টিত। ওপরের অংশ সম্পূর্ণ মাটি। বাদশাহ স্বয়ং হাত দিয়ে পাথর পরিষ্কার করে জমে থাকা ধুলিবালি একটি থলিতে ভরে নিয়ে সেই স্থানে জমা দেন, যেখানে নবী করীম (সাঃ)-এর নানা স্মৃতি সংরক্ষণ করা হয়েছে।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বই মেলায়

মসজিদে নববীতে রিয়াজুল জান্নাতে আসরের নামাজ আদায় করে **'বাবুস সালাম'** নামক দরজা দিয়ে বের হচ্ছিলাম। এ সময় আমার সাথে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী ছিলেন। হঠাৎ আমার পিছন থেকে একজন আমাকে লক্ষ্য করে আহ্বান জানালো, **'আচ্ছালামু আলাইকুম শায়খ সাঈদী!'**

সালাম জানানোর ভঙ্গী ও সম্বোধনের উচ্চারণই আমাকে জানিয়ে দিলো, আহ্বানকারী আরবী ভাষী। পিছনে ঘুরে তাকিয়ে দেখি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং ভাইস চ্যান্সেলর আমাকে ডাকছেন। দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি আমাকে পরম মমতায় নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন। অনেক দিন পূর্বে সাউদী সরকারের রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালনকালে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অথচ দীর্ঘদিন পরেও তিনি আমার নাম স্মরণে রেখেছেন এবং পিছন দিক থেকে আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছেন– আল হামদু লিল্লাহ্।

সেই সুদূর অতীতকাল থেকেই আরবের লোকদের স্মরণশক্তি সারা দুনিয়ায় প্রবাদ-বাক্য তুল্য। সে যুগে লিখে কোনো কিছু সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা ছিলো না বিধায় তারা নিজের বংশাবলী এবং অতীত ইতিহাস বংশপরম্পরায় সংরক্ষণ করতো। এমনকি কোনো কবিতা একবার শুনলেই তারা মুখস্থ শুনাতে পারতো। নবী করীম (সাঃ)-এর নবুয়াত লাভের বিষয়টি সারা আরবে লোকজনের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিলো। হযরত আমর ইবনে সালামা (রাঃ)-এর বয়স যখন মাত্র ছয় অথবা সাত বছর। তাঁর গোত্র বাস করতো মক্কা থেকে অনেক দূরে এক পাহাড়ী ঝর্ণাধারার পাশে। এই ঝর্ণার পাশ দিয়ে লোকজন ব্যবসা উপলক্ষ্যে মক্কায় যাতায়াত করতো এবং ঝর্ণার কাছে থেমে কথাবার্তা বলতো। বিশেষ করে নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা করতো এবং মক্কা থেকে পবিত্র কোরআনের যে সকল আয়াত তাঁরা শুনতো, তা এখানে আলোচনার সময় পুনরাবৃত্তি করতো।

হযরত আমর ইবনে সালামা (রাঃ) সেই শিশু বয়সেই লোকজনের মুখ থেকে পবিত্র কোরআন একবার শুনেই স্মরণে রাখতেন। এরপর মক্কা বিজয়ের পরে যখন বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলো, সে সময় তাঁর গোত্রের লোকজন মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার পরে নবী করীম (সাঃ) তাঁদেরকে জামায়াতে নামাজ আদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির কোরআন বেশী জানা রয়েছে, সে যেনো জামায়াতে ইমামতী করে।' হযরত আমর (রাঃ)-এর গোত্রের লোকজন নিজেদের মধ্যে কোরআন কে বেশী জানে, তার সন্ধান করলো। দেখা গেলো, মাত্র ছয় সাত বছর বয়সের শিশু হযরত আমর ইবনে সালামা (রাঃ)-ই কোরআন বেশী মুখস্থ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি ব্যবসায়ী কাফেলার লোকদের কাছ থেকে কোরআন শুনে মনে রাখতাম তাই সবাই আমাকে ইমামতির জন্য সামনে এগিয়ে দিলো। আমি তখন ছয় বা সাত বছরের বালক। আমার পরিধানে একটি চাদর ছিলো। আমি সিজদা দিলে তা গায়ের সাথে জড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে যেতো। এ অবস্থা দেখে গোত্রের একজন মহিলা বললো, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনের অংশ আবৃত করো না কেন? সুতরাং সবাই মিলে কাপড় কিনে আমাকে জামা বানিয়ে দিলো। সেই জামা পেয়ে আমি এতো আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে ততো আনন্দিত হইনি।' (বোখারী)

এ থেকেই বুঝা যায়, আরবীয়দের স্মরণশক্তি কতটা উচ্চ পর্যায়ে থাকলে কোরআন একবার মাত্র শুনেই স্মরণে রাখতে পারতো।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে কুশল বিনিময় করলাম। তিনি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার জন্যে দাওয়াত দিলেন। যদিও আমি ইতোপূর্বে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েকবার পরিদর্শন করেছি। আমি তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে ২১শে মার্চ **ডক্টর সাইফুল ইসলাম, ডক্টর ওয়াহিদ, হাফেজ আব্দুল হালীম, হাফেজ আব্দুস সালাম ও রফিকুল ইসলামহ** বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে আমি অবাক হলাম। এটা যেনো ইতোপূর্বে দেখা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় নয়– নতুন এক বিশ্ববিদ্যালয়। যেদিকেই চোখ যায় সেদিকেই নতুন সাজ। কেনো বিশ্ববিদ্যালয় নতুন সাজে সেজেছে, জানতে পারলাম এখানে 'বইমেলা' অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিভিন্ন লেখকের নিত্য-নতুন বই সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করা আমার সেই কিশোর বয়সের অভ্যাস। বই সংগ্রহ করতে করতে নিজ বাসভবনে মহান আল্লাহর রহমতে মোটামুটি এক লাইব্রেরী গড়ে তুলেছি। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বইমেলা অনুষ্ঠিত

হচ্ছে, এ জন্যে প্রথমেই বইমেলার দিকে এগিয়ে গেলাম। বিশাল এক হলরুমে বিখ্যাত চিন্তাবিদদের রচিত গবেষণাধর্মী বই দিয়ে নানাভাবে সাজানো হয়েছে। একই গ্যালারীতে সকল বই একত্রে সাজানো হয়নি। গ্রন্থসমূহ সাজানো হয়েছে বিষয়ভিত্তিকভাবে। দুষ্প্রাপ্য তাফসীর, বর্তমান যুগের তাফসীর, হাদীস গ্রন্থসমূহ, ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহ ও কোরআন-হাদীসের ভিত্তিতে রচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহ পৃথক পৃথক গ্যালারীতে সাজানো রয়েছে।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভিসি ও শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন গ্যালারী ঘুরে ঘুরে সম্পূর্ণ বইমেলা আমাকে দেখালেন এবং বহু কিতাব উপহার দিলেন। যে সকল কিতাব আমার সংগ্রহে নেই আমি সেগুলো গ্রহণ করে অন্যগুলো রেখে দেয়ার জন্যে বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানালাম। এরপরেও উপহারের বোঝা এমন ভারী হয়ে গেলো যে, প্লেনের যাত্রী হিসেবে অনুমোদিত ওজনের দ্রব্য-সামগ্রীর তুলনায় অনেক বেশী ওজন হয়ে গেলো। আমি বাধ্য হয়ে অনেক কিতাব রেখে এসেছি, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে সেগুলো নিয়ে আসবো ইন্‌শাআল্লাহ।

বইমেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনা, দর্শক-ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি দেখে আমার দেশের বইমেলার দূরাবস্থার কথা মনে পড়লো। শুধু তাই নয়, এই বইমেলায় আগত লোকদের দেখেও আমি অনুভব করলাম, শিক্ষিত জ্ঞানপিপাসু লোকদেরকে এই বইমেলা প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। নিছক আনন্দ দেয়ার মতো বা অর্থহীন কোনো বই এখানে নেই। এই বই মেলার প্রত্যেকটি বই-ই মানুষকে সত্য-সঠিক পথের পথিক বানানোর জন্যে যথেষ্ট।

মদীনা থেকে খায়বরের পথে

মদীনায় অবস্থানকালেই সিদ্ধান্ত হলো, ঐতিহাসিক খায়বর ও তাবুকসহ আরবের ঐসব এলাকা নিজের চোখে দেখবো, যেখানে মানব সম্প্রদায়ের দৈহিকভাবে সবথেকে শক্তিশালী জনগোষ্ঠী– ইতিহাসে যারা আ'দ ও সামূদ নামে অভিহিত, তারা যে এলাকায় বসবাস করতো এবং আল্লাহর গযবে যারা সমূলে ধ্বংস হয়েছিলো, সেসব এলাকা ভ্রমণ করবো।

২০০৭ সালের ২৩শে মার্চ, পবিত্র শুক্রবার। মদীনার মসজিদে নববীতে রিয়াজুল জান্নাতে ফজরের নামাজ আদায় করে নবী করীম (সাঃ)-কে সালাম জানিয়ে হোটেলে এলাম বিশ্রাম গ্রহণ করার জন্যে। কিন্তু বিশ্রাম গ্রহণ করা হলো না। ছুটির দিন শুক্রবার। ফলে মদীনায় অবস্থানরত বাংলাদেশীদের অনেকেই আমার সাথে

সাক্ষাৎ করার জন্যে হোটেলে এসেছে। সকলেই দেশের অবস্থা জানার জন্যে উদগ্রীব। তাদের সাথে সাক্ষাৎ শেষ করে গোসল সেরে জুমুআ নামাজ আদায়ের জন্যে পুনরায় মসজিদে নববীতে গেলাম। নামাজ শেষে হোটেলে ফিরে এসে দুপুরের খাবার খেয়েই মদীনা থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে সাউদী আরবের আল উলা জেলার দিকে যাত্রা করলাম। আলউলা সাউদী আরবের পর্যটন এলাকা এবং এখানে রয়েছে পর্যটন নগরী। পর্যটকগণই এখানে অধিক পরিমাণে এসে থাকেন। **'মাদায়েনে সালেহ্'** আল উলা জেলার অন্তর্ভুক্ত।

সফরসঙ্গী বেশী থাকার কারণে তিনটি গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। সফরসঙ্গীদের মধ্যে যারা ছিলেন তাঁরা সকলেই বাংলাদেশের অধিবাসী। আমি যে গাড়ীতে উঠলাম সে গাড়ীতে ছিলো আমার পরম স্নেহের বরিশাল শার্ষীনার অধিবাসী বর্তমানে স্বপরিবারে মদীনা প্রবাসী **হাফেজ আব্দুস সালাম, ডক্টর মাওলানা সাইফুল ইসলাম,** তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি শেষ করেছেন, **মাওলানা হাসান,** তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গাড়ী চালক হিসেবে ছিলেন চট্টগ্রাম সাতকানিয়ার অধিবাসী মদীনা প্রবাসী **রফিকুল ইসলাম**। গাড়ী চালানো তাঁর পেশা নয়, তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী। কিন্তু গাড়ী চালনায় তিনি দক্ষ চালককেও হার মানাবেন। আল উলা জেলার অন্তর্গত **'মাদায়েনে সালেহ্'** যাবার পথেই খায়বর এলাকা। মদীনা থেকে খায়বারের দূরত্ব ২৮৫ কিলোমিটার।

দীর্ঘ যাত্রা পথের একঘেয়েমী বা অবসাদ দূর করার জন্যে **ডক্টর সাইফুল ইসলাম** সর্বোত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সাথে নিয়েছিলেন বিখ্যাত কিতাব **'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।'** মূলত এ কিতাবটি একটি বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ। আমরা যে এলাকায় আ'দ ও সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাচ্ছি, সেই জাতি, তাদের কার্যক্রম ও তাদের ধ্বংসের বিস্তারিত ঘটনা এ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসলে যিনি যার প্রেমিক, সেদিকেই তাঁর লক্ষ্য থাকে। **মাওলানা সাইফুল ইসলাম** জ্ঞানের প্রেমিক, জ্ঞানের কুঞ্জবনে তিনি যেনো এক মধুমক্ষিকা। সামান্যতম সময়ও তিনি অপচয় করতে ইচ্ছুক নন। জ্ঞানার্জনের জন্যে তিনি সময়কে সঠিকভাবেই কাজে লাগান। গাড়ীতে বসে তিনি আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া থেকে আ'দ ও সামূদ জাতি এবং মাদায়েনে সালেহ্ সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ পড়ে শোনাতে লাগলেন। আমি নীরবে একনিষ্ঠ শ্রোতার মতো শুনতে থাকলাম। রফিকুল ইসলামের চালনায় পিচঢালা প্রশস্ত মসৃণ রাস্তা বেয়ে গাড়ী তীব্র গতিতে সম্মুখের

দিকে এগিয়ে চলেছে। আমার কান রয়েছে মাওলানা সাইফুল্লাহর পড়ার দিকে, আর চোখ দুটো রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য দেখায় ব্যস্ত। পথের দু'পাশে পাহাড় আর খেজুরের বিশাল বাগান। মাঝে মধ্যে রয়েছে জনবসতী।

প্রায় তিন ঘন্টা একটানা চলার পর সউদী আরবের খায়বর এলাকায় গাড়ী প্রবেশ করলো। এটা সেই খায়বর, যেখানে নবী করীম (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্যে তাঁর খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশানো হয়েছিলো। খায়বারে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হয়েছে, বহু সাহাবা এখানে শাহাদাতবরণ করেছেন। আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো হাদীস গ্রন্থসমূহে এবং ইতিহাসে পড়া খায়বর যুদ্ধের ইতিহাস।

খায়বর যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি

আজ পবিত্র শুক্রবারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে আরেকটি এমন এক স্থানের পাশে নিয়ে এলেন, যে স্থান নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র সাহাবায়ে কেরামের পদরেণু ধন্য স্থান। এখানে বহু সাহাবায়ে কেরাম চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেক ফোটা রক্তের বিনিময়ে এই খায়বার থেকে অযুত কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তার মহাপবিত্র নাম **'আল্লাহ'**। পবিত্র ভূমি এই খায়বারকে অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা তাদের মুরব্বীদের সহযোগিতায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্যে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তারা অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্রের নতুন যে মানচিত্র প্রস্তুত করেছে, সে মানচিত্রে এই খায়বারকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। সউদী গোয়েন্দা বিভাগের কাছে তত্ব রয়েছে, ইসলামের দুশমন ইয়াহূদীরা সাউদী আরবের বিশেষ বিশেষ এলাকায় গুপ্ত হত্যা, বোমা হামলা ও বিশৃংখলা ঘটাবে। ইতোমধ্যে নানা ধরণের দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এ কারণে সরকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে।

এবার খায়বার যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে পাঠকের জ্ঞাতার্থে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। হূদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পরে নবী করীম (সাঃ) সন্ধির কল্যাণে পৃথিবীর মানুষের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌছে দেয়ার জন্য দূত প্রেরণে ব্যস্ত, ঠিক এ সময় ইয়াহূদীরা পুনরায় উৎপাত শুরু করে দিল। ফলে হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার মাত্র বিশ দিন পরেই নবী করীম (সাঃ)-কে খায়বরে যুদ্ধের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। খায়বর শব্দটি ইবরানী ভাষার এবং এ শব্দের অর্থ দুর্গ। এই স্থানটি মদীনা থেকে ২৮৫ কিলোমিটার উত্তরে সিরিয়ার সীমান্তের

কাছে। এই এলাকায় প্রচুর আবাদ যোগ্য ভুমি রয়েছে। এখানে বিশাল বিশাল খেজুরের বাগান ছিল এবং ইয়াহূদীদের নির্মিত বিশালাকারের দুর্গ ছিল। সেসব দুর্গের অস্তিত্ব বর্তমানেও রয়েছে।

বহুপূর্ব থেকেই এখানে ছিল ইয়াহূদীদের আবাস। মদীনা থেকে যেসব ইয়াহূদীদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাদের নেতৃবৃন্দ এই খায়বরেই স্বজাতিদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে নেতার পদে বরিত হয়েছিল। খায়বরের ইয়াহূদীরাই ছিল খন্দকের যুদ্ধের সংগঠক। অপকর্মের কারণে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, খন্দকের যুদ্ধ ব্যর্থ হলো, মদীনার বনী কুরাইজার ইয়াহূদীরা নিজেদের পাপের কারণে শাস্তি ভোগ করেছিল, এ সব কারণে তাদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

তারা একটি বিষয় স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিল, এক সময়ের অপ্রতিরোধ্য মক্কার কুরাইশ শক্তি বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু প্রায়। কুরাইশ শক্তির মেরুদন্ড এমনভাবে ভেঙ্গে গেছে যে, তাদের পক্ষে আর কখনো কোমর সোজা করে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। পরপর কয়েকটি যুদ্ধ করে উদিয়মান মুসলিম শক্তিও বর্তমানে নিজের অর্থনীতি গোছাতে ব্যস্ত। মুসলমানদের বেশ কয়েকজন বীর যোদ্ধা ওহূদের প্রান্তরে শাহাদাতবরণ করেছে। সুতরাং এই সুযোগে মদীনার ওপর আক্রমন করে মুসলিম শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া যায়। এসব দিক চিন্তা করে তারা মদীনা আক্রমণ করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হলো।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গাতফান গোত্রকে খায়বরে উৎপন্ন ফসলের লোভ দেখিয়ে তাদেরকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ করলো। অন্যান্য কয়েকটি গোত্রকে ঘুষ দিয়ে তাদের পক্ষে টানলো। নবী করীম (সাঃ) যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টায় থাকলেন। কিন্তু অশান্তি প্রিয় ইয়াহূদীরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করলো যে, শান্তির আর কোনো পথই অবশিষ্ট রইলো না। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলো এবং যুদ্ধে ইয়াহূদীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুপম দৃষ্টান্ত

নবী করীম (সাঃ) খৃষ্টান ও ইয়াহূদীদেরকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখুন। মদীনার সিনাই পাহাড়ের কাছে সেন্ট ক্যাথারিন (Saint Catharin) নামক মঠের ধর্ম যাজকদেরকে লিখিত সনদ দিয়েছিলেন। এই সনদে তাদেরকে নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা দান করে আদেশ জারি করেছিলেন, 'কোনো মুসলমান খৃষ্টানদের সাথে এই সনদের বিপরীত কোনো কাজ করলে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।'

নবী করীম (সাঃ) ঘোষনা করেছিলেন, 'তারা সাহায্য প্রার্থী হলে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর গ্রহণ করা যাবে না। তাদের ওপরে শক্তি প্রয়োগ বা কোনো ধরণের লোভ-লালসা দেখিয়ে ধর্ম ত্যাগ করানো যাবে না। তাদের কোনো ধর্ম নেতাকে তার পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না। কোনো তীর্থযাত্রীকে বাধা দেয়া যাবে না। কোনো ধর্মনেতাকে তার মঠ থেকে বিতাড়ন করা যাবে না। গির্জা ধ্বংস করে সেখানে কোনো মুসলমান কিছু করতে পারবে না। তাদের ধর্ম তারা স্বাধীনভাবে পালন করবে।'

নবী করীম (সাঃ)-এর এই সনদ সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, It is a monument of enlightened tolerance. অর্থাৎ এই সনদ অসাধারণ পরধর্মসহিষ্ণুতার কীর্তি স্তম্ভস্বরূপ।

খায়বার যুদ্ধে যেসব যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিলো, এসবের মধ্যে ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের বেশ কয়েকটি কপিও ছিলো। পরাজিত ইয়াহূদীরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করলো, আমাদের ধর্ম গ্রন্থসমূহ অনুগ্রহ পূর্বক ফেরৎ দিন। সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণীবাহক আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন তাওরাতের কপি ইয়াহূদীদের কাছে ফেরৎ দেয়ার জন্যে। তৎক্ষণাত নির্দেশ পালিত হলো। এ ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং ইয়াহূদী পন্ডিত ডঃ ইসরাঈল ওয়েলফিন্সন তাঁর রচিত গ্রন্থে বলেন, 'এই ঘটনা থেকে আমরা পরিমাপ করতে পারি যে, এসব ধর্মীয় গ্রন্থের প্রতি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হৃদয়ের সম্মান-মর্যাদা কোন্ পর্যায়ের ছিলো। তাঁর এই ঔদার্য্য, উদারতা ও সহনশীলতার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিলো ইয়াহূদীদের ওপর। ইয়াহূদীদের এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তিনি তাদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থসমূহের প্রতি এমন কোনো আচরণ করেননি, যা ধর্মগ্রন্থ অবমাননার পর্যায় ভুক্ত। আর এই ঘটনার বিপরীতে ইয়াহূদীদের এটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, খৃষ্টানরা তাদের সাথে কেমন নির্মম আচরণ

করেছিলো। রোমান খৃষ্টানরা যখন খৃষ্টপূর্ব ৭০ সনে জেরুযালেম জয় করে, তখন অসংখ্য তাওরাতে তারা অগ্নি সংযোগ করেছিলো এবং তাওরাতের পাতা ছিঁড়ে পদদলিত করেছিলো। সাম্প্রদায়িক ও ঈর্ষাকাতর খৃষ্টানরা স্পেনে ইয়াহূদীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দিয়ে তাওরাতসমূহ আগুনে নিক্ষেপ করেছিলো। এখানেই ইসলাম এবং খৃষ্টবাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য, যা আমরা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মধ্যে দেখতে পাই।' (তা'রীখুল ইয়াহূদ ফী বিলাদিল আরাব, পৃষ্ঠা-১৭০)

এই ঘটনার বিপরীতে ইরাক, আফগানিস্থান ও গুয়ান্তানামো-বে কারাগারের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমেরিকার খৃষ্টান সৈন্যবাহিনী মসজিদসমূহে বোমা নিক্ষেপ করছে, নামাজ আদায়রত মুসলমানদের ওপর গুলি চালিয়ে পাখির মতো হত্যা করছে। পবিত্র কোরআনে অগ্নি সংযোগ ও পদদলিত করছে। নিজেরা পবিত্র কোরআনের ওপর প্রসাব করছে এবং মুসলিম বন্দীদেরকেও নির্যাতনের মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ওপর প্রসাব করতে বাধ্য করছে। অতীতের মুসলমানদের কীর্তিগাঁথা ইতিহাস আর বর্তমানে মুসলমানদের করুণ অবস্থা স্মরণে আসতেই আমার বুকের মধ্য থেকে তোলপাড় করে মর্মযন্ত্রণা হাহাকার হয়ে বেরিয়ে এলো। জানিনা, এই করুণ অবস্থা থেকে মুসলিম মিল্লাত কখন মুক্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে।

আলোর প্লাবনে প্লাবিত আল উলা প্রদেশ

খায়বার এলাকা অতিক্রম করে গাড়ী চলে এলো বৃক্ষ, তরুলতা ও জনমানবহীন পাহাড়ের সাম্রাজ্যে। প্রশস্ত মসৃণ রাস্তার দু'পাশে পাথুরে পাহাড় যেনো পরস্পরে হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার কাছে যেনো মনো হলো পাহাড়ের এই সাম্রাজ্য বুঝি কখনো শেষ হবার নয়। সফর সঙ্গীদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, প্রায় দুইশত কিলোমিটারেরও অধিক রাস্তা এমন গাছপালা ও জনমানবহীন। হাতের মোবাইল ফোন সেটের দিকে তাকিয়ে দেখি নেটওয়ার্ক নেই। সফর সঙ্গীদের কাছে প্রশ্ন করলে তাঁরা জানালো, দুইশত কিলোমিটারের মধ্যে নেটওয়ার্ক পাওয়া যাবে না।

মক্কা থেকে মদীনায় গাড়ী যোগে আসার পথে দেখেছি, রাস্তার দুই পাশেই প্রায় দশ ফুট উচ্চ লোহার নেট দিয়ে ঘেরা। দেড়শত বা দুইশত কিলোমিটার বেগে এসব রাস্তায় গাড়ী চলাচল করে। হঠাৎ করে কোনো উট বা পাহাড়ে বসবাসরত প্রাণী রাস্তায় গাড়ীর সম্মুখে চলে এলে দুর্ঘটনা এড়ানোর কোনো উপায় থাকে না। এসব রাস্তায় দুর্ঘটনার অর্থই হলো মুহূর্তে মানবদেহ চর্বিত তৃণখন্ডের মতো হয়ে যাওয়া। এ

ধরণের দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যেই সাউদী সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মক্কা থেকে মদীনা আসার রাস্তার দুই পাশে নেট দিয়ে বেষ্টনী দিয়েছেন। কিন্তু খায়বার থেকে আল উলা জেলার দিকে আমরা যে নির্জন প্রশস্ত পথ বেয়ে যাচ্ছি, সে রাস্তার দুই পাশ উন্মুক্ত। এই রাস্তায় এ কারণে গাড়ী চালকগণ বেশ সতর্ক হয়েই গাড়ী চালান।

সফর সঙ্গীদের কাছ থেকে জানলাম, এই পাহাড়ী এলাকার স্বাস্থ্যবান উটগুলো ভয়ঙ্কর বেপরোয়া। এরা সম্মুখে গাড়ী দেখলেই হিংস্র হয়ে ওঠে এবং কখনো কখনো লাফিয়ে গাড়ীর ওপর ওঠে। বিশাল আকৃতির উট গাড়ীর ওপর যখন ওঠে, তখন আরোহীসহ সে গাড়ী চ্যাপটা হয়ে স্যান্ডউইচের আকার ধারণ করে। এই নির্জন পথে দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো গাড়ী যদি বিকল হয়ে যায় বা দুর্ঘটনা কবলিত হয়, সাহায্য পাবার কোনো আশাই থাকে না। কারণ আশেপাশে কোনো জনবসতী নেই। তবে কিছুদূর পরপর পাহাড়ের গায়ে সাউদী সরকার উৎকীর্ণ করে দিয়েছে, **'সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, তাওয়াক্‌কালতু আলাল্লাহ্, হাস্‌বু কাল্লাহ, উয্‌কুরুল্লাহ** (আল্লাহকে স্মরণ করো), **আল্লাহু আকবার**।' পথে বেশ দূরে দূরে রয়েছে চোকপোষ্ট, সাউদী সরকারের আর্মি পথে চলা গাড়ী ও যাত্রীদের চেক করে থাকে। আমাদেরও বেশ কয়েক বার তাদের মুখোমুখি হতে হলো। পূর্বে এসব ব্যবস্থা ছিলো না, ইয়াহূদীদের নতুন ষড়যন্ত্রই সাউদী সরকারকে নিরাপত্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে বাধ্য করেছে।

সূর্য তখন পশ্চিম গগনে দিগচক্রবালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আসরের নামাজ আদায়ের সময় ঘনিয়ে এলো। মহান মালিকের দরবারে মাথা নত করার জন্যে হৃদয় ব্যকুল হয়ে উঠলো। সফর সঙ্গীদের কাছে জানতে চাইলাম, আসরের নামাজ কোথায় আদায় করবো। তাঁরা জানালো, সম্মুখেই পথের পাশে ছোট্ট একটি পল্লী রয়েছে। সেখানের মসজিদে আমরা আসরের নামাজ আদায় করবো। বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে **রফিকুল ইসলাম** পথের পাশে একটি পল্লী মতো এলাকায় গাড়ী থামালো। এই এলাকায় বেশ কয়েকটি ঘর বাড়ি রয়েছে। এলাকার জনসংখ্যা খুবই অল্প। এলাকার মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করে পুনরায় গাড়ীতে উঠে বসতেই রফিকুল গাড়ী ছুটিয়ে দিলো আল উলা শহরের দিকে।

নবী-রাসূলদের পদরেণু ধন্য আল উলা নগরী

সাউদী আরবের একটি বিশাল প্রদেশের নাম আল উলা। আধুনিক স্থাপত্য এই প্রদেশটিকে দৃষ্টি নন্দন হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। এই প্রদেশের রাস্তা-পথ, যান বাহন, বাড়ি-ঘর, অফিস-আদালত, পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, কল-কারখানা, পল্ট্রি ও পশুর খামারসহ ইত্যাদিতে রয়েছে আধুনিকতার উন্নত ছোঁয়া। সাউদী সরকার সারা দেশের জনগণের সুযোগ-সুবিধাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। জনগণের কল্যাণে যে কোনো সিদ্ধান্তও যেমন খুবই দ্রুত নেয়া হয়, তেমনি তা বাস্তবায়নেও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জনকল্যাণমূলক কোনো সিদ্ধান্ত 'ফাইল বন্দী' থাকার বা 'কালক্ষেপণের' কোনো সুযোগই সেখানে নেই।

বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টি নন্দন উপকরণ ও বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে আল উলা প্রদেশকে সাজানো হয়েছে। চিত্ত বিনোদনের বৈধ উপকরণ দিয়ে অনেকগুলো পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। সবথেকে বড় এবং দর্শনীয় পার্কটির নাম কিং আব্দুল আযীয পার্ক। দর্শনীয় একটি সিটি নির্মাণ করে এর নাম দেয়া হয়েছে ইসলামিক সিটি। পাহাড় কেটে সর্বাধুনিক রাস্তাপথ নির্মাণ করা হয়েছে। জনগণকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয়ভাবে যেমন দেশের জনগণকে শিরক্ ও বিদআত থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি জনগণকে ইসলামের সঠিক আকিদা-বিশ্বাস শিক্ষা দেয়ার জন্যে বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। পানির এমন সহজলভ্য ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, আল উলা প্রদেশে বর্তমানে প্রবেশ করে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, দূর অতীতে এখানে পানির জন্যে পায়ে হেঁটে বা উটে আরোহণ করে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে পানির কূপের কাছে যেতে হতো।

মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা প্রবেশ পথের চেকপোষ্ট অতিক্রম করে বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত আল উলা শহরে প্রবেশ করলাম। যে হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, সেখানে গাড়ি থামতেই আমি অবাক বিস্ময়ে ছোটো খাটো একটি সমাবেশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আল উলা প্রদেশে সাত হাজার বাংলাদেশী বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। অনেকে এখানে স্বপরিবারে বাস করছে। ছুটির দিন হবার কারণে আমার দেশের প্রবাসী ভাইয়েরা আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যে সমবেত হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার বিলাল সাহেব এখানে প্রায় দুই

যুগ ধরে স্বপরিবারে বসবাস করছেন। তাঁর জামাতা **মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবও** এখানে কর্মরত। শ্বশুর-জামাইয়ের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ছোটো খাটো সমাবেশটি আমাকে ঘিরে ধরলো।

সকলের সাথে কুশল বিনিময়ের পরে হোটেলে আমার জন্যে নির্ধারিত কক্ষে গেলাম। দীর্ঘ পাঁচশত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আসার কারণে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আরামদায়ক পানি দিয়ে অজু করার পর ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়ে গেলো। অযু শেষে বের হতেই জানালা পথে দৃষ্টি চলে গেলো আলো ঝলমল শহরের দিকে। মন চলে গেলো সেই সুদূর অতীতের পাতায়। এই এলাকায় ইতিহাসের কোনো এক যুগে আল্লাহর নবী হযরত হূদ (আঃ) ও হযরত সালেহ (আঃ) এবং তাঁদের সাহাবায়ে কেরাম বিচরণ করেছেন। এখানে বিচরণ করেছেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম।

ইঞ্জিনিয়ার বিলাল সাহেবের ডাকে কল্পনা থমকে দাঁড়ালো। নাস্তা প্রস্তুত করা হয়েছে। ওদিকে সাউদী সরকারের Ministry of Islamic Affairs & Endowment & Call & Guidance এখানে আমার আসা উপলক্ষ্যে মাহফিলের আয়োজন করেছে। নাস্তা খেয়েই ওখানে যেতে হবে। দ্রুত নাস্তা সেরে হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ী চলতে শুরু করলো। হঠাৎ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার গাড়ীর পিছনে গাড়ী বহর আমাকে অনুসরণ করছে। আমাকে যারা অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলো তাঁরাই গাড়ীতে আসছে।

মাহফিলে প্রবাসীদের প্রাণ উজাড় করা ভালোবাসা

শহরের মধ্য দিয়ে গাড়ী ধীর গতিতে এগিয়ে গেলো মাহফিলের জন্যে নির্ধারিত বিশাল হলরুমের দিকে। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এখানে সাত হাজারেরও অধিক বাংলাদেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। শুক্রবার ছুটির দিন হবার কারণে দূর-দূরান্ত থেকে অনেকেই মাহফিলে যোগ দিয়েছে। আমি হলরুমে প্রবেশ করে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। হলরুম পরিপূর্ণ হয়ে মানুষ আশেপাশে অবস্থান নিয়েছে। আমার জন্যে নির্ধারিত আসনের দুই পাশে আল উলা প্রদেশের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ আসন গ্রহণ করেছেন। আমার বক্তব্য রেকর্ড ও চলমান দৃশ্য ধারণ করার জন্যে আধুনিক উপকরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সেখানের বিখ্যাত আলেমদের সাথে কুশল বিনিময় শেষে আমি বক্তব্য পেশ করলাম।

আল্লাহর প্রশংসা ও নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি দরুদ পেশ করে আমি সমবেত বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্য বললাম, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে

আপনাদেরকে এমন একটি দেশে বসবাস, কর্মসংস্থান ও অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন, যে দেশটি অগণিত নবী-রাসূল ও তাঁদের পবিত্র সাহাবায়ে কেরামের পদরেণু ধন্য দেশ। এই দেশেই রয়েছে মহাসম্মানিত ঘর পবিত্র বায়তুল্লাহ। এই দেশেই ঘুমিয়ে রয়েছেন মানবতার মুক্তির দুত বিশ্বনবী (সাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরাম। এ কারণে আপনারা সবথেকে বেশী করে মহান আল্লাহর শোকর আদায় করবেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করার তেমন সুযোগ নেই। কিন্তু এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমি আরো বললাম, আমাদের দেশে রাষ্ট্রযন্ত্র ইসলামের পক্ষে ব্যবহার না হবার কারণে সাধারণ মানুষকে সহজেই ইসলাম সম্পর্কে ভুল পথে এগিয়ে দেয়ার সুযোগ রয়েছে এবং এই সুযোগকে পথভ্রষ্টের দল সর্বোতভাবে কাজে লাগিয়েছে। এর ফলে যুগের পরে যুগ ধরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে গলত আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে আসছে। এখানে অবস্থানের সুযোগে এদেশের আলেম ওলামাদের সান্নিধ্যে এসে গলত আকিদা-বিশ্বাস দূর করার সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

বর্তমান দুনিয়ায় মুসলমানদের অবনতির কারণ এবং এই দূরাবস্থা থেকে পরিত্রাণের একটি মাত্র উপায় হলো পবিত্র কোরআনকে অনুসরণ করা– এ সম্পর্কে কোরআন-হাদীসের দলিলভিত্তিক আলোচনা শেষ করে প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যে বললাম, আপনারা দেশে অবস্থিত পরিবার-পরিজনের কাছে বৈধ পথে অর্থ প্রেরণ করবেন। সরকারকে রেমিটেন্স থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনাদের প্রেরিত অর্থ দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করবে। এদেশে যে আইন-কানুন রয়েছে, তা মেনে চলার ক্ষেত্রে এদেশের নাগরিকদের তুলনায় আপনারা অধিক সচেতনতার পরিচয় দিবেন। আপনাদের আচরণ-ব্যবহার দেখে এদেশের সরকার, বিভিন্ন কল কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং সাধারণ জনগণ যেনো আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এদেশের সরকার যেনো কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশীদের প্রাধান্য দেয়। আপনারা আপনাদের সার্বিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা অব্যহত রাখবেন।

কারণ আমাদের দেশে বিপুল জনশক্তি রয়েছে। জনশক্তিকে কাজে লাগানোর মতো কর্মক্ষেত্র আমাদের দেশে নেই। এই দেশে কর্মক্ষেত্র রয়েছে কিন্তু রয়েছে কর্মীর অভাব। আপনাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে এদেশের সরকার যদি আমার দেশ থেকে

সর্বাধিক কর্মী আমদানী করে, তাহলে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হবে। এভাবে আপনারা প্রবাসে থেকেও দেশের জন্যে বিরাট কল্যাণ বয়ে আনতে পারেন।

আমি লক্ষ্য করলাম, বক্তৃতায় আমি কি বলছি তা বুঝার জন্যে মাহফিলে উপস্থিত সাউদী আরবের সম্মানিত আলেমগণ দোভাষীর সাহায্য গ্রহণ করছেন। সাউদী সরকারের Ministry of Islamic Affairs & Endowment & Call & Guidance নামক প্রতিষ্ঠানটি শুধু মাহফিলেরই আয়োজন করেননি। মাহফিলে উপস্থিত সকল শ্রোতাদের রাতের আহারের ব্যবস্থাও করেছেন।

মিহি বস্ত্রখন্ডের ন্যায় রুটির আবরণ

মাহফিল আয়োজকদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ছিলো খুবই সুন্দর। শ্রোতাদের জন্যে রাতের খাবারের ব্যবস্থাপনাও ছিলো অদ্ভুত ধরণের সুন্দর। বিশাল আকৃতির ষ্টীল প্লেট পরিপূর্ণ বাঁশমতি চাউলের ভাত বিশেষ। এই ভাত আমাদের দেশের মতো শুধু নিবিড় চাউল দিয়ে রান্না করা সাদা ভাত নয়। রান্নার সময় ওরা বিশেষ ধরণের মসলা ব্যবহার করে ফলে সে ভাত কিছুটা সোনালী রং ধারণ করে। আরবীয়রা এর নাম দিয়েছে খ্যাঁফ্ছা। এই খ্যাঁফ্সা ওরা বেশ মজা করেই খায়। আর ভিন্ন দেশের নাগরিকদের মধ্যে যারা খ্যাঁফ্ছা খেয়ে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে, তাদের কাছেও এই খাদ্য বেশ রুচিকর। তবে ভিন্ন দেশের কোনো নাগরিক হঠাৎ করে এই খাদ্য তৃপ্তিভরে খেতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ।

খ্যাঁফসার ওপর রয়েছে গোটা দুম্বা বা খাসির রোস্ট আর রোস্টটি আবৃত করা হয়েছে পাতলা কাপড়ের মতো রুটি দিয়ে। সেই সাথে রয়েছে বোতলজাত পানি এবং প্রত্যেকের জন্যে একবার মাত্র ব্যবহারের জন্যে বিশেষ কাগজে প্রস্তুত করা পানপাত্র। খাদ্য রান্না ও পরিবেশনে সম্পূর্ণ আরবীয় ঐতিহ্য বজায় রাখা হয়েছে। প্রতি দশজনের জন্যে খাদ্যে পরিপূর্ণ একটি প্লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে, প্লেটটি আকৃতিতে কত বড়। খাদ্য পরিবেশনের পরে আহার পর্ব শুরু হলো। খাদ্যপাত্র আবৃত করা বিশাল পাতলা রুটিটি দেখতে অফ্ হোয়াইট কালারের পাতলা কাপড়ের মতো। হঠাৎ করে কেউ দেখলে এটিকে কাপড় বলেই মনে করবে, যেমনটি মনে করে ছিলাম আমি নিজে।

আমি লক্ষ্য করলাম, আমার সাথে যারা বসেছেন তারা প্রত্যেকেই হাতের দুই আঙ্গুল ব্যবহার করে কাপড়ের মতো রুটি ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছেন। আমি রুটিকে কাপড় মনে

করে হাত গুটিয়ে বসে ভাবছিলাম, এদেশে কাপড় আবার খাদ্যের তালিকায় এলো কবে থেকে! তারপর ভালো করে লক্ষ্য করতেই বুঝলাম, এটা কাপড় নয়, সুস্বাদু রুটি যা আমাদের দেশে চা-পাতি রুটি নামে পরিচিত। আমি অবাক হলাম, এত বিশাল আকৃতির রুটি এরা প্রস্তুত করেছে কিভাবে! শুধুমাত্র হাতের সাহায্যে এতবড় পাতলা রুটি প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই আধুনিক কোনো মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে।

আমাদের বাংলাদেশে যেমন ভাতই মানুষের প্রধান খাদ্য, তেমনি আরবের লোকদের প্রধান খাদ্য হলো রুটি। ভাত জাতিয় ঐ খ্যাঁফসাও এরা কমই খেয়ে থাকে। রুটি প্রধান খাদ্য হবার কারণে এদেশে নানা ধরণের ও আকৃতির রুটি প্রস্তুত করা হয়। স্বাদের দিক থেকেও এসব রুটি ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক দেশের নাগরিকই তাদের দেশী খাদ্যে অভ্যস্ত এবং দেশী খাবার খেয়ে যে তৃপ্তি তারা বোধ করবে, ভিন্ন দেশের খাদ্য খেয়ে স্বাভাবিকভাবেই সে তৃপ্তি পাবে না। আমার ক্ষেত্রেও তাই-ই হলো। তৃপ্তিভরে আমি খেতে পারলাম না। আহার পর্ব শেষে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। তবে সাউদী আরবের আলউলা প্রদেশের আলেম ওলামাদের আন্তরিক ব্যবহার ও আতিথেয়তা (Hospitality) এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের হৃদয়তা ও মমতাপূর্ণ ব্যবহার আমাকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছে যে, তা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে।

গযবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এলাকার দিকে

২০০৭-এর ২৪শে মার্চ। শনিবার। আজই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। মদীনা থেকে যেতে হবে রাজধানী শহর রিয়াদে। মধ্যপ্রাচ্যের সবথেকে বড় শহর রিয়াদ। এই রিয়াদেই আগামী ২৭শে মার্চ আরব লীগের ১১টি দেশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এর মধ্যেই সাউদী সরকারের সহযোগিতায় রিয়াদেই বেশ কয়েকটি মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। আল্লাহর এই গোলামকে ঐসব মাহফিলে আলোচনা রাখতে হবে।

ফজরের নামাজ আদায় করে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। তারপর নাস্তা সেরে হোটেল থেকে বাইরে এসে আবারো বিস্মিত হলাম। গতকাল যখন মদীনা থেকে খায়বার হয়ে এই আলউলা প্রদেশে এলাম, তখন সফর সঙ্গীসহ তিনটি গাড়ীতে এসেছিলাম। আজ যখন মাদায়েনে সালেহ অর্থাৎ মহান আল্লাহর আযাবের চাবুক যেখানে হানা হয়েছিলো, সে এলাকায় যাচ্ছি তখন সফর সঙ্গীর সংখ্যা অনেক। ফলে তারা সাতটি গাড়ীর ব্যবস্থা করেছে।

আমি আমার জন্যে নির্ধারিত গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাইড হিসেবে আমার গাড়িতে সাথী হলেন **ইঞ্জিয়ার হেলাল সাহেব**। বিদেশীদের জন্যে এই এলাকায় প্রবেশের জন্যে অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা পূর্বেই করেছিলেন। আলউলা প্রদেশ থেকে মাদায়েনে সালেহ যার প্রাচীন নাম হিজর, মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মাদায়েনে সালেহের প্রবেশ পথেই রয়েছে আর্মি চেকপোস্ট। চেক পোস্টের প্রক্রিয়া শেষে আমাদের গাড়ী বহর প্রবেশ করলো মাদায়েনে সালেহ এলাকায়। এই এলাকায় প্রবেশের সাথে আমার মনে পড়লো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাবধান বাণী–

اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِي الاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِيْ الاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ–

এ লোকগুলো কি (আমার) যমীনে বিচরণ করেনা? (বিচরণ করলে) তারা দেখতে পেতো, এদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিলো; অথচ, শক্তিমত্তার দিক থেকে (বলো) এবং যে সব কীর্তি তারা (এ) দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে, (সেদিক থেকে) যমীনে তারা ছিলো (এদের তুলনায়) অনেক বেশী প্রবল। (কিন্তু) আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অবধ্যতার কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করলেন। (তখন) তাদের আল্লাহ তা'য়ালার গযব থেকে রক্ষা করার কেউই ছিলো না। (সূরা মু'মিন-২১)

নবী করীম (সাঃ)-ও আল্লাহর গযব নিপতিত এলাকা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তাবুক অভিযানকালে এই এলাকা অতিক্রম করার সময় রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে তাদের আবাসস্থানে তোমরা প্রবেশ করো না। তাদের ওপর যে আযাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, তা যেনো তোমাদের ওপর নিপতিত না হয়। তবে আল্লাহর গযবের ভয়ে কান্নাকাটি করতে করতে এই এলাকা অতিক্রম করো। তারপর তিনি চাদর দিয়ে নিজের মাথা আবৃত করে এই এলাকা দ্রুত অতিক্রম করলেন। (বোখারী)

সেই গযব নিপতিত এলাকায় আমি সফর সঙ্গীদের নিয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুসারে এই এলাকা দ্রুত অতিক্রম করতে হবে। খুব অল্প সময়ে আমি এই মাদায়েনে সালেহ এলাকায় অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিদ্রোহীদের ওপর যেখানে গযব নাযিল করেছিলেন, সেই এলাকা ভালোভাবে দেখলাম। এই এলাকার ইতিহাস আমি ইতোপূর্বেই তথ্য নির্ভর ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পাঠ করেছিলাম। এখানে আমি আমার নিজ চোখে যা কিছু দেখলাম, এই এলাকার ইতিবৃত্ত এবং এই এলাকাকে কেন্দ্র করে মানবেতিহাসে যা কিছু ঘটেছে তা এখানে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

মাদায়েন নামকরণের ইতিবৃত্ত

মাদায়েন এলাকাটি ঐতিহাসিক কারণেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই এলাকায় হযরত শুআইব (আঃ) নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) মিসর থেকে ফিরআউনের গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসে দশ বছরকাল অতিবাহিত করেছিলেন। হযরত হূদ (আঃ) ও হযরত সালেহ (আঃ)-ও এই এলাকায় দায়িত্ব পালন করেছেন। নানা কারণে আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়ও এই এলাকায় বসবাস করেছে এবং এখানেই তারা মহান আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়ে সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

এই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের নামকরণ বিশেষ কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি, প্রাণী, পাহাড়, খাদ্যবস্তু তথা জড় বা অজড় পদার্থের কারণে হয়েছে। তেমনি এই মাদায়েনও মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এক সন্তানের নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং উক্ত সন্তানের পরবর্তী বংশধরও মাদায়েন গোত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলো।

ক্ষত-বিক্ষত সারিবদ্ধ পাহাড়

আমার নিজ চোখে দেখা আ'দ ও সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ এবং মাদায়েনে সালেহ্ এলাকার অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনার সূচনা আমি হযরত নূহ (আঃ), যাকে **'সানায়ে আদম'** অর্থাৎ দ্বিতীয় আদম বলা হয়, তাঁর যুগের মহাপ্লাবনের ঘটনা দিয়েই শুরু করতে চাই। কারণ আমি মহান আল্লাহর গযব নিপতিত এলাকার যে

জাতিদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ নিজ চোখে দেখে এলাম, সেই জাতিদ্বয় হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের মহাপ্লাবন পরবর্তী জাতি এবং তারা ছিলো তাঁরই বংশধর। হযরত নূহ (আঃ)-কে আল্লাহ তা'য়ালা সাড়ে নয় শত বছর হায়াত দিয়েছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর বহুদূর পর্যন্ত পৌছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছরব্যাপী তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু হাতে গোণা গুটি কয়েক মানুষ ব্যতীত আর কেউ-ই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না।

বিশেষ করে তাঁর জাতির নেতৃবৃন্দ নিজেরা যেমন ছিলো পথভ্রষ্ট তেমনি তারা তাদের অনুসারীদেরও পথভ্রষ্ট করে আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দেয়া থেকে বিরত রেখেছিলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গযবের ফায়সালা জানিয়ে দিয়ে তাঁর নবীর প্রতি আদেশ দিলেন নৌকা প্রস্তুত করার জন্যে। নৌকা প্রস্তুত হলো। মহান আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন, সে সময় ঘনিয়ে এলো। হযরত নূহ (আঃ)-কে আল্লাহ জানিয়েছিলেন বিশেষ একটি নিদর্শনের কথা। যখন তিনি সেই নিদর্শন দেখবেন, তখন তাঁকে বুঝতে হবে আল্লাহর আযাব অতি নিকটে। সেই নিদর্শনের কথা আমরা পবিত্র কোরআন থেকে জানতে পারি যে, চুলার তলদেশ হতে পানি নির্গত হওয়া। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ، قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ، وَمَا اٰمَنَ مَعَه اِلاَّ قَلِيْلٌ–

এইভাবে যখন আমার আদেশ এলো আর সেই চুলাটা উথলে উঠলো। তখন আমি বললাম, প্রত্যেক ধরনের জন্তু-জানোয়ার এক-এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নাও। তোমার পরিবারের লোকদেরকেও–অবশ্য তাদের ব্যতীত যাদেরকে পূর্বেই চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে–এতে তুলে নাও। আর সেই লোকদেরকেও এতে উঠিয়ে নাও যারা ঈমান এনেছে। তবে নূহের সাথে ঈমান এনেছে তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। (সূরা হূদ-৪০)

কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, মোট লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ জনের মত। হযরত নূহ (আঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে আদেশ দিলেন নৌকার উঠার জন্য। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا، اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

নূহ বললো, তোমরা এতে উঠে বসো। আল্লাহর নামেই এটা চলতে থাকবে এবং স্থিতি লাভ করবে। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। (সূরা হূদ-৪১)

হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর ঈমানদার সাথীরা নৌকায় উঠলো, আল্লাহ তা'য়ালাও সাথে সাথে আদেশ দিলেন–

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ، وَّ فَجَّرْنَا الاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ–

তখন আমি আকাশের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত করে মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করিয়েছি এবং যমীন দীর্ণ করে প্রস্রবনে পরিণত করেছি। আর এই সমস্ত পানি সেই কাজটি পূর্ণ করার কাজে লাগলো, যা পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। (সূরা ক্বামার-১১-১২)

আকাশের প্রতি আদেশ করা হলো, পানি বর্ষন করতে থাকো মুষল ধারায়। যমীনের প্রতি আদেশ করা হলো, তোমার বুকে যে প্রস্রবন রয়েছে তা থেকে পানি উদগীরণ করতে থাকো। পানির উচ্চতা যে কোন্ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল, তা বর্তমানে গবেষকগণও সঠিকভাবে উদঘাটন করতে পারেনি। তারা শুধু এতটুকুই বলে যে, পৃথিবীর সুউচ্চ পর্বতসমূহ পানির নীচে তলিয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহর বিধানের সাথে যারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল, তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, তারা সবাই নিমজ্জিত হলো এবং তারা জাহান্নামের কঠিন আগুনে শাস্তি পেতে থাকলো। মহান আল্লাহ বলেন–

مِمَّا خَطِيْئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا، فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا–

তাদের নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে এবং অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ অবস্থায় তারা নিজেদের জন্য আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে রক্ষাকারী সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে পেল না। (সূরা নূহ-২৫)

পানির গভীরতা যত বেশী হয় পানির ঢেউ ততবড় হয়। সে সময় মহাপ্লাবনের ফলে পানির গভীরতা যে কত অধিক ছিল, এ সম্পর্কে কোরআন সঠিক পরিমাপ না বললেও এ কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এক একটি ঢেউ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে আসছিল। পানিতে নিমজ্জিত হয়ে পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গ তলিয়ে দেয়া ঢেউয়ের আঘাতে ইসলামদ্রোহী জাতি ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে তাদেরকে ইসলাম বুঝানো হচ্ছিলো। তবুও তারা ইসলাম বুঝলো না, এর সাথে বিদ্রোহীর মতই আচরণ করছিল।

উত্তাল তরঙ্গ মালার আঘাতের তীব্রতা যে কতটা ভয়াবহ ছিলো, দীর্ঘ পাঁচ ছয় হাজার বছর পরেও সেই লোমহর্ষক দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে যেসব দীর্ণ-বিদীর্ণ পর্বতসমূহ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা আমি নিজ চোখে দেখে এলাম। ঢেউয়ের আঘাত কতটা প্রচন্ড হলে পাথুরে পাহাড় ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঢেউয়ের প্রচন্ডতা কেমন ছিলো, সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ শোনাচ্ছেন−

وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ-

এরপর সে নৌকা পাহাড়সম বিশাল আকৃতির ঢেউয়ের মধ্যে তাদের বয়ে নিয়ে চলতে থাকলো। (সূরা হূদ-৪২)

মাদায়েনে সালেহ্ এলাকায় একটি পাহাড় আমার চোখে পড়লো, পানির তীব্র স্রোত আর প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে বিশাল পাথুরে পাহাড়ের মধ্যের অংশ এমনভাবে ক্ষয়ে গিয়েছে যে, কঙ্করময় ভূমি সংলগ্ন নীচের অংশের ব্যসার্ধ আর আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ওপরের অংশের ব্যসার্ধ প্রায় সমান। মাঝের অংশ চারদিক থেকে এমনভাবে ক্ষয়ে গিয়েছে যে, পাহাড়টি ছাতার আকার ধারণ করেছে। কাঠ বা লৌহ দন্ডের ওপরের অংশকে কেন্দ্র করে যেমন ছাতা বিস্তৃত হয়, তেমনিভাবে উক্ত পাহাড়টি থামের আকৃতির একটি দন্ডের ওপরে যেনো মহাশূন্যে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

পানির প্রবল স্রোতে কতক পাহাড় চারদিক থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কোথাও মোটা এবং কোথাও সরু দন্ডের মতো আল্লাহর নাযিল করা আযাবের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশাল আকৃতির শক্তিশালী ঢেউ একের পর এক পাহাড়সমূহে আঘাত হেনেছে, ফলে কোনো পাহাড় ভাঙাচোরা বট গাছের আবার কোনোটি পেয়েছে হাতীর আকৃতি। হাতীর আকৃতির পাহাড়টি দূর থেকে দেখলে মনে হবে হাতী যেনো শূঁড় দিয়ে মাটি থেকে কিছু কুড়িয়ে নিচ্ছে। এ কারণে বর্তমানে উক্ত পাহাড়টির নামকরণ করা হয়েছে '**জাবালুল ফিল**' বা হাতি পবর্ত।

ঢেউয়ের প্রচন্ড আঘাতে পাথুরে পাহাড়ের মধ্যে কোথাও সুড়ঙ্গ তৈরী হয়েছে, কোথাও তৈরী হয়েছে বিশাল আকৃতির গর্ত। পাহাড়ের নীচের অংশ এমনভাবে ভেঙে পানির স্রোতের সাথে ভেসে গিয়েছে যে, ওপরের বিশাল অংশের সামান্য একটি দিক মূল পাহাড়ের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এর তলদেশ দিয়ে যাওয়ার সময় বা দেখলে মনে হবে, এখুনি বুঝি ওপরের অংশ মাথার ওপর আছ্‌ড়ে পড়বে। এসব দৃশ্য দেখলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়, হাজার হাজার টন ওজনের পাথর কিভাবে মহাশূন্যে কয়েক হাজার বছর ধরে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্থির রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ইসলাম বিদ্রোহী মানব গোষ্ঠীর ওপর নাযিল করা আযাবের এসব দৃশ্য এখন পর্যন্ত অমলিন রেখেছেন, আযাব পরবর্তীকালের মানুষের শিক্ষার জন্যে। এসব ভয়াবহ দৃশ্য দেখে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করবে, আল্লাহর বিধানের সাথে অবাধ্যতা প্রদর্শন করলে তাদের পরিণতি এর থেকেও করুণ হতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা যখন পানিকে আযাব হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন এর ভয়াবহতা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া 'সুনামীর' ধ্বংসলীলা টেলিভিশনের পর্দায় দেখলেই অনুমান করা যায়।

মহাপ্লাবনের পরিধি কি পৃথিবীব্যাপী ছিলো

আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হয়ে যখন ইসলামের শত্রুগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তখন আযাবের এলাকা সমূহ পূর্বের আকার ধারণ করলো। মহান আল্লাহ আদেশ দিলেন–

وَقِيْلَ يَاَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَ يسَمَاءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِىَ الاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ–

হে যমীন! তোমার সব পানি গিলে ফেল আর আকাশ থেমে যাও। তারপর পানি যমীনে বসে গেল এবং ফায়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেল। কিশতী জুদী পর্বতের গায়ে এসে ভিড়লো। তারপর বলে দেয়া হলো, জালিম লোকজন দূর হয়ে গেল। (সূরা হূদ-৪৪)

জুদী পাহাড় বর্তমান ইরাকের কুর্দিস্তান এলাকায় জাজীরায়ে ইবনে উমার-এর উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। বাইবেলে এই কিশতীর অবতরণের স্থান বলা হয়েছে, আরারাত পর্বতকে। আরারাত পাহাড় আর্মেনিয়ার একটি পাহাড় এবং সেই সাথে একটি পর্বত

মালার নাম। পর্বতমালা বলতে যে আরারাত পাহাড়কে মনে করা হয়, তা আর্মেনিয়ার উচ্চ মালভূমি হতে শুরু করে দক্ষিণে কুর্দিস্তান পর্যন্ত চলে গিয়েছে। আর জুদী পর্বত বা জাবালূল জুদী এরই একটি পাহাড়ের নাম। এখানে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মীয় একটি উপাসনালয় ছিল, যাকে বলা হত নৌকার উপাসনালয়।

বর্তমানেও এই নামেই পর্বতটি পরিচিত। প্রাচীন ইতিহাসে এটাই কিশতী অবতরণের স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈসা মসীহের আড়াইশত বছর পূর্বে বেবিলনের বেরাসুস (Berasus) নামক এক ধর্মীয় নেতা প্রাচীন কালদানীয় বর্ণনার ভিত্তিতে নিজ দেশের যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তাতেও তিনি কিশতী অবতরণের স্থান হিসেবে এই জুদী পর্বতের নামই উল্লেখ করেছেন। এরিষ্টটলের শিষ্য আবিডেনাসও (Abydrnus) স্বলিখিত ইতিহাসে একেই সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তিনি সে সময়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইরাকের অসংখ্য মানুষের কাছে এই জাহাজের চূর্ণ টুকরা সুরক্ষিত রয়েছে এবং তা ধুয়ে বা দ্রবীভূত করে রোগীদের ঔষধ হিসেবে খাওয়ানো হয়।

পবিত্র কোরআনে যে প্লাবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কি বিশ্বব্যাপক প্লাবন ছিল না হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি যে এলাকায় বাস করতো, সে এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল? এটা এমন এক প্রশ্ন যে, এই প্রশ্নের মীমাংসা আজ পর্যন্তও হয়নি। বাইবেলের আদি পুস্তকে বলা হয়েছে, এই প্লাবন ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্রই বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে কোনো কথা উল্লেখ করা হয়নি।

কোরআন থেকে যা জানা যায় তাহলো, পরবর্তী মানব বংশ হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের প্লাবন হতে রক্ষা প্রাপ্ত মানুষেরই সন্তান মাত্র। কিন্তু কোরআনের এই কথা থেকে প্লাবন সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল কিনা তা নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হয়না। কারণ এ কথা এভাবেও সত্য হতে পারে যে, এই সময় সমগ্র মানব বংশের বিস্তৃতি ঘটেছিল ঐ এলাকায় এবং তাদের বসতীও ছিল ঐ এলাকায়। অর্থাৎ সকল মানব বংশের অস্তিত্ব ছিল শুধুমাত্র প্লাবন উপদ্রুত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আর প্লাবনের পরে যে মানব বংশ সৃষ্টি হয় তা ক্রমশঃ সারা দুনিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। দুটো জিনিসের মাধ্যমে এই কথা প্রমাণিত হয়। প্রথমত দজলা ও ফোরাত এলাকায় একটি মহাপ্লাবন সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক বিবরণ, প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন ও ভূ-স্তরের বর্ণনা থেকে। কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র এলাকা থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না বলে প্লাবনকে বিশ্বব্যাপী প্লাবন ছিল বলে বলা যায় না।

আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির লোকজনের মধ্যে এই মহাপ্লাবনের কথা প্রাচীনকাল থেকেই জনশ্রুতি হিসেবে চলে আসছে। এমনকি অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও নিউগিনির প্রভৃতি দূরতম অঞ্চলগুলোর প্রাচীন বর্ণনায়ও এই প্লাবনের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, ইতিহাসের কোনো এক সময় এ সব জাতির পূর্বপুরুষগণ হয়ত একই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল যেখানে প্লাবন এসেছিল। পরে তাদের বংশধররা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এই বিবরণও তাদের মুখে মুখে বিস্তার লাভ করেছিল।

আবার কোনো কোনো জড়বাদী গবেষকদের মতে এই ধরনের প্লাবন পৃথিবীতে একটি নয়, অনেকবার এসেছে। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার পর্বত শৃঙ্গে এমন সব প্রাণীর ফসিল (Fossil) পাওয়া গেছে, কঙ্কাল এবং নানা ধরণের হাড় পাওয়া গেছে, যেসব প্রাণী পানি ব্যতীত টিকতে পারে না। ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা এসব প্রাণী ছিল জলজ প্রাণী। সুতরাং ভূ-গোলকের বিভিন্ন পর্বত শ্রেণীর সেই উচ্চ চূড়াসমূহের ওপর এসব প্রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, ইতিহাসের কোনো এক বাঁকে এমন এক প্লাবন এসেছিল যে, সে প্লাবনের স্রোতধারায় সারা পৃথিবী নিমজ্জিত হয়েছিল। প্লাবন সংক্রান্ত কাহিনী পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মগ্রন্থেই বিদ্যমান। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহেও এই প্লাবনের কাহিনী উল্লেখ রয়েছে।

মানব বংশের দ্বিতীয় সূচনা

মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ (আঃ) ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যে মানব সম্প্রদায় গঠন করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, কালক্রমে সেই মানব সম্প্রদায় আল্লাহর বিধান থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছিল। নিজেদের স্বার্থের কারণে তারা আল্লাহর বিধানকে বিকৃত করেছিল। এক ও একক আল্লাহর দাসত্ব ত্যাগ করে সমাজের নেতৃবৃন্দের, প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম-পদ্ধতির দাসত্বসহ প্রকৃতির দাসত্ব করা শুরু করেছিল। এই মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর বিধানের অধীন করে তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করার জন্যে মহান আল্লাহ হযরত হুদ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত হতে জানা যায় যে, **''মিম বা'দে ক্বাওমে নূহ''** অর্থাৎ নূহের পরের সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের কেউ কেউ দাবী করেছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রাগ দুই হাজার বছর পূর্বে এই আ'দ জাতির উত্থান ঘটেছিল। মহাপ্লাবনের পরে সিরিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয়বার যখন মানুষের বসতি আরম্ভ হয়, তখন এই জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

তারা পাহাড় খোদাই করে এমন ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেছিল, যা বর্তমানে আবিষ্কার হচ্ছে। অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সাউদী আরবের এই এলাকায় আদ এবং সামুদ জাতি কর্তৃক পাহাড় খোদাই করে নির্মিত সেসব অট্টালিকা দীর্ঘ কয়েক হাজার বছর পরেও মাথা উঁচু করে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে আমাকে ঐসব অট্টালিকা দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আদ এবং সামুদ জাতি স্থাপত্য শিল্পে এতটা উন্নতি করেছিল যে, তাদের মনে অহঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের তুলনায় সৃষ্টি জগতে শক্তিশালী দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তারা স্থাপত্য শিল্পে ছিল অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় পারদর্শী। বর্তমানে সভ্যতা গর্বী মানুষ যেমন ইসলামকে সেকেলে মনে করে ত্যাগ করার পক্ষপাতি। আল্লাহর বিধান সত্য বটে কিন্তু তা বর্তমান পৃথিবীর জন্য উপযোগী নয়– এই কথাগুলো ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রভাবে তথাকথিত মুসলিমদের মুখেই শোনা যায়। আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে তারা মানুষের তৈরী করা আদর্শ অনুসরণ করতে চায়। তাদের এই প্রয়াস অহংকারেরই ফলশ্রুতি। মহান আল্লাহ বলেন, আ'দ জাতিও সভ্যতাগর্বী ছিল। তাদের অহংকারের কারণে তাদের পরিণতি কি হয়েছে, তা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখো। মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، اَلَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِىْ الْبِلاَدِ، وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوْا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وَفِرْعَوْنَ ذِىْ الاَوْتَادِ، اَلَّذِيْنَ طَغَوْا فِى البِلاَدِ–

তুমি কি দেখোনি তোমার মালিক আ'দ জাতির লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? এরাম গোত্র ছিলো উঁচু স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী। জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের দিক থেকে জনপদে তাদের মতো কাউকেই এর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়নি। উন্নত ছিলো সামূদ, তারা পাহাড়ের উপত্যকায় পাথর কেটে সুরম্য অট্টালিকা বানাতো। (সূরা ফজ্র-৬-৮)

বিশাল আকারের দৈহিক গঠন ও দৈহিকভাবে বিপুল শক্তিশালী হবার কারণে অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হয়ে প্রকাশ্যেই ঘোষনা করতো, 'আমাদের তুলনায় শক্তিশালী আর কেউ নেই।' আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অবস্থা শোনাচ্ছেন–

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً–

আ'দ জাতির ঘটনা ছিলো, তারা আল্লাহর যমীনে অন্যায়ভাবে দম্ভভরে ঘুরে বেড়াতো এবং বলতো, আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে? (সূরা হামীম সিজদা-১৫)

হযরত হূদ (আঃ) আ'দ জাতির প্রতি আহ্বান জানালেন, তোমরা সকল প্রকার দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করো। সকল ইলাহ্ ও রব্-কে অস্বীকার করো। শুধুমাত্র এক আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নাও, তাঁর আইন অনুসরণ করো এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করো। তাহলো এই পৃথিবী এবং আখিরাতে শান্তি লাভ করবে।

অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে তারা আল্লাহর নবীর আহ্বান অস্বীকার করেছিল। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। অশান্তি সৃষ্টি করা হতে যদি তোমরা বিরত না হও, তাহলে তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। বারবার সতর্ক করার ফলেও তারা যখন অন্যায় অত্যাচার করা থেকে বিরত হয়নি, তখন তাদের ওপরে সিদ্ধান্তকারী আযাব নেমে এসেছিল।

আ'দ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আ'দ জাতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটি কথা স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, এই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় সত্য হলো পবিত্র কোরআন। আর কোরআন ব্যতীত কোনো ইতিহাস বা বাইবেলও আ'দ জাতি সম্পর্কে তেমন কোনো গ্রহণযোগ্য আলোচনা করেনি। সুতরাং পবিত্র কোরআন আ'দ জাতি সম্পর্কে যা আলোচনা করেছে, তাই-ই হলো সেই জাতির ইতিহাস। আর গবেষকগণ যা আবিষ্কার করেছেন, তা তাদের ধারণাপ্রসূত এবং অনুমান। সুতরাং গবেষকদের ধারণা সত্য আর মিথ্যায় জড়িত অনুমান ভিত্তিক। পক্ষান্তরে আল্লাহর কোরআন এই দুর্বলতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ) নির্ভরযোগ্য গবেষকদের উদ্ধৃতি দিয়ে তাফহিমুল কোরআনে আ'দ জাতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, 'আ'দ জাতিই ছিল আরবের একটি প্রাচীনতম জাতি। এই জাতি সম্পর্কে নানা ধরণের কিংবদন্তী আরববাসীর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কিশোর-বালকরা পর্যন্ত তাদের ইতিহাস জানতো। তাদের শক্তি ও প্রতাপ সেখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হতো।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যহল ইবনে শাইবান গোত্রের একজন লোক নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসেছিল। সে ছিল আ'দ জাতি যে এলাকায় বাস করতো সে এলাকার অধিবাসী। সে ব্যক্তি নবী (সাঃ)-কে আ'দ জাতি সম্পর্কে প্রাচীনতম কাল হতে এই এলাকার মানুষদের মধ্যে বংশানুক্রমে প্রচলিত কিস্‌সা কাহিনী শুনিয়েছিল। পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে এই আ'দ জাতির প্রকৃত বাসস্থান ছিল আহ্‌কাফ নামক এলাকায়। এই এলাকা হিজাজ, ইয়েমেন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী আর রুবউল খালীর দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় অবস্থিত। বর্তমানে এখানে বালুকা স্তুপ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই এলাকা থেকেই তারা বিস্তার লাভ করেছিল। তারা ইয়েমেনের পশ্চিম উপকূল হতে ইরাক পর্যন্ত বসতী স্থাপন করেছিল। ঐতিহাসিক বিচারে এই জাতির নাম নিশানা প্রায় পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তবুও দক্ষিণ আরবের কোনো কোনো স্থানে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রয়েছে, যা আ'দ জাতির ধ্বংসাবশেষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে James R. Wellestad নামক একজন ইংরেজ, যিনি ছিলেন নৌবাহিনীর একজন অফিসার। তিনি হিস্‌নে গুরাব নামক এলাকায় একটি প্রাচীন পাথর আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই পাথরে হযরত হুদ (আঃ)-এর নাম লেখা ছিল। এই শিলালিপি হতে জানা যায় যে, হযরত হুদ (আঃ)-এর আদেশ উপদেশ অনুসারে যারা চলতো, এটা তাদেরই শিলালিপি। আরবের প্রচীন গোত্র সামের সাথে সম্পর্কিত একটি শক্তিশালী এবং পরাক্রমশালী গোষ্ঠীর নাম হলো আ'দ। হিব্রু ভাষায় 'আ'দ' শব্দের অর্থ হলো, উচ্চ ও বিখ্যাত। এই জাতি সে সময় বিশালাকারের অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল এবং বিশাল পাহাড় কেটে শৈল্পিক কর্ম করেছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়'।

সাউদী আরবের বিস্তীর্ণ মরুভূমি আল রুবউল খালী এলাকায় ২০০৪ সনে জ্বালানী তেল অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ARAMCO নামক এক কোম্পানী খনন কাজ চালাতে গিয়ে আদ জাতির নরকঙ্কালের সন্ধান পেয়েছে। সেই কঙ্কালের কপাল থেকে মুখের নিচে চিবুক পর্যন্ত যতটা দৈর্ঘ, বর্তমান কালের মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্তও ততটা দৈর্ঘ নয়। এ থেকেই বুঝায় যায়, তাদের গোটা দেহের দৈর্ঘ কি বিশাল আকৃতির ছিল।

আ'দ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও আদর্শ

পবিত্র কোরআন থেকে এ কথা জানা যায় যে, হযরত হূদ (আঃ)-এর সম্প্রদায় আল্লাহকে অস্বীকার করতো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে এ প্রয়োজনীয়তাকেও তারা অস্বীকার করতো না। আসলে তারা হযরত হূদ (আঃ)-এর যে কথাটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো তাহলো, তারা এক মাত্র আল্লাহকে ইলাহ এবং রব হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা কেউ মূর্তি পূজা করতো কেউ বা প্রকৃতির পূজা করতো। আল্লাহর পক্ষ হতে যে জীবন বিধান এসেছিল, তা তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না।

বর্তমান সমাজে যেমন নামাজ আদায় করতে হবে, রোজা পালন করতে হবে, হজ্জ আদায় করতে হবে, কালেমা পাঠ করতে হবে, এসব কথা অস্বীকার করার মত লোক বোধহয় একেবারেই নগণ্য। এসব কথার প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে তা পালন করারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। কোরআনের বিধানকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোরআনের আইনকে গ্রহণ করা হচ্ছে না। নবী করীম (সাঃ)-কে গ্রহণ করা হচ্ছে একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে। তাঁকে মানব জাতির মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না বা তাঁকে একমাত্র অনুকরণীয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না।

প্রতিটি নবীর যুগে সে জাতির অবস্থাও ছিল বর্তমান যুগের মানব জাতির অনুরূপ। বর্তমান সমাজে আল্লাহর কোনো বুযর্গ ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে তাঁর কবর কিছু দিনেরই মধ্যেই অর্থ উপার্জনের আখড়ায় পরিণত হয়। মাজার বানিয়ে তাঁর পূজা করা হয়। কবরে শায়িত ব্যক্তিকে মুক্তিদাতা ও আশা আকাংখা পূরণের অধিকারী মনে করা হয়। তেমনি সে যুগেও কোনো বুযর্গ ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে তাঁর কবরকে পূজার আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর মূর্তি বানিয়ে তাকে পূজা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর আমলে যেসব মূর্তি ছিল হযরত হূদ (আঃ)-এর যুগেও তেমনি মূর্তির সৃষ্টি করা হয়েছিল।এসব মূর্তির নাম ছিল ইয়াগুছ, ওয়াদ ও সুওয়া। হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাদের একটি মূর্তির নাম ছিল সামুদ, আরেকটি মূর্তির নাম ছিল হাতার, ছাদা নামক যে মূর্তিটি ছিল তা ছিল সে সময় অত্যন্ত বিখ্যাত। এভাবে তারা ধর্মীয়

জীবনে এমন সব জড় পদার্থের কাছে নিজেদের আশা আকাংখা পেশ করতো, যা ছিল তাওহীদী আকিদা বিশ্বাসের পরিপন্থী। রাজনৈতিক জীবনে তারা আল্লাহর দেয়া বিধান ত্যাগ করে বর্তমান কালের অনুরূপ মানুষের বানানো আইন কানুন অনুসরণ করতো।

বর্তমান যুগের অনুরূপই আ'দ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব কর্তৃক রচিত আইন কানুন গোটা সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। অপরাধী যদি সমাজের বিত্তবান লোক হতো তাহলে তারা বিচারের সম্মুখীন হতো না। অথচ একই অপরাধের কারণে সমাজের গরীব মানুষগুলো চরম জুলুমের শিকার হতো। নবী করীম (সাঃ)-এর সময় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে সে সমাজের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। বর্তমান আমাদের সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়।

মুসলিম বলে যারা দাবী করে, তারা নিজেদের জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। একটি হলো ধর্মীয় জীবন আরেকটি হলো রাজনৈতিক জীবন। কিন্তু ইসলাম মানুষকে এই অধিকার দেয়নি। ইসলামে রাজনৈতিক জীবন বা ধর্মীয় জীবন বলতে পৃথক কিছু নেই। মানুষের গোটা জীবনই পরিচালিত হবে মহান আল্লাহর আইন দ্বারা। আ'দ জাতি নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত নিজেদের মনগড়া আইন কানুন অনুসরণ করতো। নির্দিষ্ট কোনো আদর্শ বা মতবাদ তারা অনুসরণ করতো না। সমাজের বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথাই ছিল তাদের আদর্শ ও আইন।

অতীত ইতিহাস বর্তমানকালের মানুষদের পাথেয়

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ হযরত হূদ (আঃ)-এর উল্লেখ করেছেন তিনটি সূরায় সাত স্থানে। আল্লাহ সেই জাতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, যারা ছিল মানব ইতিহাসের যে কোনো সম্প্রদায়ের তুলনায় শক্তিশালী। তারা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করেছিল। এ কারণে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। তারা যখন ধ্বংস হয়েছিল, তখন তাদের শক্তি তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সেই জাতির দৈহিক আকার আকৃতি ও শক্তির সাথে তুলনা করলে পরবর্তীকালের এবং বর্তমান কালের মানুষের দৈহিক আকার আকৃতি ও শক্তিকে পিপীলিকার মতোই মনে হবে। অতুলনীয় দৈহিক শক্তির অধিকারী সেই আ'দ এবং সামুদ জাতিই যখন ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করে যমীনে টিকে থাকতে পারেনি, বর্তমানকালের এই দুর্বল মানুষ কি করে টিকে থাকতে পারে? এসব জাতির ইতিহাস বর্ণনা করে মহান আল্লাহ অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন। আল্লাহ তাঁর বিধানের সাথে বেয়াদবি ও বিদ্রোহ করার পরিণতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন–

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ، قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُه، اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ، قَالَ الْمَلاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِه اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ، قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ، اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ، وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً، فَاذْكُرُوْا اٰلاَءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَه وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا ، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ–

"এবং আ'দ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি। সে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। এখন তোমরা কি ভ্রান্ত পথে চলা হতে বিরত হবে না? জাতির নেতা এবং উচ্চ পর্যায়ের যারা তাঁর আহ্বান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, তারা উত্তর দিয়েছিল, আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত বলে মনে করি। আর আমাদের ধারণা হলো, তুমি মিথ্যাবাদী।

সে বলেছিল, হে আমার জাতি! আমি নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত নই, বরং আমি সারা জাহানের মালিক মহান আল্লাহর রাসূল। আমি তোমাদের কাছে আমার আল্লাহর পক্ষ হতে সংবাদ পৌঁছে দিই। আমি তোমাদের একজন এমন কল্যাণকামী যে, যার প্রতি তোমরা নির্ভর করতে পারো। তোমরা কি এই জন্য অবাক হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে স্বয়ং তোমাদেরই জাতির একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের স্মারক এসেছে এই জন্য যে, সে তোমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করবে। ভুলে যেও না, তোমাদের প্রতিপালক নূহের সময়ের লোকদের পরে তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের কীর্তিকলাপ স্মরণে রেখো। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

তারা উত্তর দিল, তুমি আমাদের কাছে এই জন্য এসেছো যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবো এবং আমাদের বাপ-দাদারা যাদের দাসত্ব করেছে, তাদেরকে আমরা পরিহার করবো? ঠিক আছে, তুমি তাহলে সেই শাস্তি আমাদের জন্য নিয়ে এসো, যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো, যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হও"। (সূরা আ'রাফ-৬৫-৭০)

'আমাদের পূর্বপুরুষগণ যা করেছে বা আমাদের বাপ-দাদাদের যা করতে দেখেছি, আমরাও তাই-ই করবো'– এ ধরণের কথা অতীতের লোকজন যেমন বলেছে, তেমনি বর্তমান যুগের লোকজনও বলে থাকে। যখনই মানুষের কাছে নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়, তখনই অধিকাংশ মানুষ পূর্বপুরুষ বা বাপ-দাদাদের দোহাই দিয়ে উক্ত কথা বলে থাকে। বিয়ে-শাদীর সময় বা নানা ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠানের নামে অতীত যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীতে তথাকথিত সভ্যতাগর্বী **'সুশীল সমাজ বা কালচার্‌ড'** নামে পরিচিত লোকজন এমন ধরণের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে থাকে, যার কোনো ভিত্তি নেই।

প্রত্যেক নবী-রাসূলকেও সমকালীন যুগের লোকজন উক্ত কথা শুনিয়েছে। নবী করীম (সাঃ)-এর যুগেও আরবের লোকজন প্রতিবাদের সুরে বলেছে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণ বা পিতা-পিতামহগণ যে সকল নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেছে, আমরা তা ত্যাগ করতে পারি না। তারা যা করেছেন, আমরাও তাই-ই করবো।' রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে প্রশ্ন করেছেন, 'তোমাদের পূর্বপুরুষ তথা পিতা-পিতামহগণ যদি ভুল পথ অনুসরণ করে থাকে, তোমরাও কি ভুল পথ অনুসরণ করবে?'

মানব রচিত আইন-বিধানের অনুসারীগণ ও ভ্রান্ত প্রথা, নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতির পূজারীগণ বলেছে, 'এসব আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, আমরা এই নিয়ম-পদ্ধতি ত্যাগ করতে পারিনা।'

বর্ষবরণ, বিয়ে বার্ষিকী, জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন, মৃত ব্যক্তির স্মৃতি সংরক্ষণ পদ্ধতি, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর পরে তাদের কবরকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান পালন, বুযর্গ ব্যক্তিদের কবরে গিয়ে ধর্ণা দেয়া, পৌষ মেলা, বসন্ত উৎসব, কলেরা দিবস, বিশ্ব চিন্তা দিবস, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম ও রীতি পালন করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে তার সম্পর্ক নেই। অথচ মুসলিম নামধারী ব্যক্তিবর্গই উক্ত রীতিনীতি অনুসরণ করে থাকে এবং স্বগৌরবে ঘোষণা করে, **'এসব রীতিনীতি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং প্রগতির পরিচায়ক। আমরা আমাদের ঐতিহ্য বিসর্জন দিতে পারি না।'**

অর্থাৎ তথাকথিত এসব নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতিনীতিকেই এসব প্রগতিবাদী লোকজন পূজ্য বিষয় মনে করে থাকে। এরা নিজেদেরকে জাতির কান্ডারী, পথিকৃৎ, সুশিল, সুজন (Good man, honest man, good-natured, well behaved, Civil Society) এবং নির্ভুল পথের অনুসারী বলে দাবী করে। অথচ ইতিহাসের দাবী হলো, প্রত্যেক যুগেই এই শ্রেণীর লোকজনই জাতীয় আদর্শ বিসর্জন দিয়ে জাতিকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে, দেশ ও জাতিকে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করেছে, হতদরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা দূরীকরণের নামে এরা বিলাস-বহুল জীবন যাপন করেছে। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির আবরণে আবৃত রেখে প্রকৃত সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, নিজেরা নানা ধরণের নিয়ম-পদ্ধতি, প্রথা ও রীতিনীতির জন্ম দিয়ে শ্রুতিমধুর নামকরণ করে তা সাধারণ মানুষকে অনুসরণ করতে বাধ্য করেছে। প্রত্যেক যুগেই এই শ্রেণীর লোকজন সমাজ ও দেশে সক্রিয় ছিলো এবং এখনও রয়েছে।

তথাকথিত সুজন-সুশীল সমাজের লোকজন যাকে পূজ্য বিষয় এবং অনুকরণীয় মনে করে বিভিন্ন ধরণের শ্রুতিমধুর নামকরণ করেছে, সমাজ ও দেশের একশ্রেণীর লোকজন কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সেটাকে অনুসরণ করছে। এই অবস্থা দেখে হযরত হূদ (আঃ) এসব নিয়ম, রীতি ও পূজ্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার তথা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করার আহ্বান জানালেন, তখন তারা আল্লাহর নবীর সাথে বিতর্ক সৃষ্টি করলো। তিনি তাদের কাছে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানতে চাইলেন–

اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْ اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ–

তোমরা কি আমার সাথে সেই নামগুলোর কারণে ঝগড়া করছো, যা তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে গেছে এবং যেগুলোর পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। (সূরা আ'রাফ-৭১)

অর্থাৎ তোমরা যা কিছু অনুসরণ করছো, পুজ্য বিষয় হিসেবে যেসব নাম নির্বাচন করেছো ও যেসব নিয়ম, রীতিনীতির অনুসরণ করছো, এগুলোর নামকরণ করেছে তোমাদের পূর্বপুরুষ বা অতীত হয়ে যাওয়া লোকজন অথবা সমাজের তথাকথিত 'সুজন-সুশিল সমাজ।' এই নামকরণের পক্ষে বা এসব কিছুকে অনুসরণ করতে হবে– এর পক্ষে কি তোমাদের যিনি স্রষ্টা সেই আল্লাহ তা'য়ালা কি কোনো সনদ অবতীর্ণ করেছেন? অবশ্যই তিনি তা অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং এসব কিছু ত্যাগ করো। যদি তা না করো তাহলে তাঁর পক্ষ থেকে গযব আসার অপেক্ষা করতে থাকো।

পবিত্র কোরআন আমাদেরকে জানাচ্ছে, ঐ নির্বোধ মানুষগুলো আল্লাহর বিধান শেষ পর্যন্তও মেনে নেয়নি। তারা তথাকথিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং তথাকথিত সুজন-সুশিল সমাজেরই অনুসরণ করে দেশ সমাজে শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও ইনসাফহীনতার সয়লাব বইয়ে দিয়েছিলো। ফলে মহান আল্লাহ গযব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন এবং হূদ (আঃ)-এর প্রতি যে হাতে গোণা কিছু মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করছিলো, তাদেরকে তিনি একান্ত অনুগ্রহ করে রক্ষা করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَه بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ–

শেষ পর্যন্ত আমি নিজের অনুগ্রহের সাহায্যে হুদ এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের বাঁচালাম এই সেই লোকদের মূলোৎপাটন করে দিলাম যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল এবং যারা ঈমানদার ছিল না। (সূরা আ'রাফ-৭২)

সর্বশেষ সুযোগেরও অসৎ ব্যবহার

আ'দ জনগোষ্ঠীর অতি সামান্য সংখ্যক মানুষই হযরত হূদ (আঃ)-এর আহ্বানে ইসলাম কবুল করেছিল। জাতির বৃহত্তর অংশই ছিল আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি বিদ্রোহী। তিনি অবশেষে বাধ্য হয়ে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন–

اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ–

সত্যই আমি তোমাদের এসব অকৃতজ্ঞ আচরণের কারণে তোমাদের জন্যে একটি কঠিন দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। (সূরা শু'আরা-১৩৫)

হযরত হূদ (আঃ) তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আল্লাহর করুণায় তোমরা জীবিত আছো, যিনি তোমাদেরকে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, এই পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বসবাসের উপযোগী করেছেন, তোমাদেরকে বিপুল ধন-সম্পদ দান করেছেন, তোমাদেরকে পশু-সম্পদ, সন্তান সন্ততি দিয়ে সাহায্য করেছেন, তোমাদেরকে দান করেছেন উদ্যানমালা ও ঝর্ণাধারা। দৈহিক দিক দিয়ে অতীতের যে কোনো সম্প্রদায়ের তুলনায় তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার সকল নিয়ামত ভোগ করেও কিভাবে তোমরা সেই আল্লাহর সাথেই বিদ্রোহ করছো? মনে রেখো, যদি তোমরা আল্লাহর বিধান অনুসরণ না করো, তাহলে নূহ (আঃ)-এর বিদ্রোহী জাতিকে যেভাবে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, সেই একইভাবে তোমাদেরকে তিনি ধ্বংস করে দিয়ে তোমাদের স্থলে আরেক সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করবেন।

বর্তমানেও তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ইসলাম সম্পর্কে যেমন বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলে থাকে, তেমনি সে যুগের তথাকথিত সুজন-সুশীল সমাজের লোকগুলোও বলেছিলো–

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ–

হে হূদ! তুমি সেই আযাব নিয়ে এসো, যে আযাবের ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো। যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে নিয়ে এসো সেই আযাব। (সূরা আ'রাফ-৭০)

হযরত হূদ (আঃ) বুঝলেন, এই জাতি অবাধ্যতার শেষ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে। সত্য পথে ফিরে আসার সকল দরজা এই জাতি স্বহস্তে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন এরা আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দয়া, অনুগ্রহ ও করুণা অফুরন্ত, সীমা-পরিসীমাহীন। তিনি চরম অবাধ্য বিদ্রোহী বান্দাদের ধ্বংস না করে একটু পরীক্ষায় নিক্ষেপ করে তাঁর নাযিল করা বিধানের দিকে ফিরে এসে নিজেদের অপরাধী মনোবৃত্তি সংশোধনের সুযোগ দিলেন।

মহান আল্লাহ প্রথমে তাদের ওপরে দুর্ভিক্ষ নাজিল করলেন। সিদ্ধান্তমূলক গযব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস না করে অবকাশ দান করলেন। চরম দুর্ভিক্ষ যখন দেখা দিল তখন আ'দ সম্প্রদায় ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

হযরত হূদ (আঃ) পুনরায় তাদেরকে বুঝালেন, এই দুর্ভিক্ষ তোমাদের ওপরে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক সংকেত হিসেবে এসেছে। এখনও তোমরা সতর্ক হও। আল্লাহর কাছে তওবা করে তোমরা তাঁর দ্বীনের পথে ফিরে এসো। তোমরা উন্নতির চরম শিখরে গিয়ে পৌছাবে। মাটির নীচের খনিজ সম্পদ তোমাদেরকে দান করবেন, এই মরু ও পাহাড়ী এলাকায় তোমরা পানির জন্যে কষ্ট পেয়ে থাকো, আল্লাহ তা'য়ালা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদেরকে প্রাচুর্যতা দান করবেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা শোনাচ্ছেন–

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ–

হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে নিজের অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাও। তাঁর দাসত্বের দিকে ফিরে এসো। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তোমার প্রতি প্রচুর বৃষ্টি

বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাবেন এবং তোমাদের আরো শক্তি যুগিয়ে তোমাদের বর্তমান শক্তি বৃদ্ধি করবেন, সুতরাং তোমরা অপরাধী হয়ে তাঁর দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখো না। (সূরা হূদ-৫২)

আ'দ সম্প্রদায় আল্লাহর নবীর কথায় কান দিল না। বরং পূর্বের তুলনায় প্রবল শক্তিতে ইসলামের সাথে বিরোধিতা করতে থাকলো। মহান আল্লাহ এবার এই অবাধ্য জাতিকে আর সুযোগ দিলেন না। তিনি এমন আযাব অবতীর্ণ করলেন যে, আ'দ সম্প্রদায় ইতিহাসের কল্পকাহিনীতে পরিণত হলো। হযরত হূদ (আঃ) এবং তাঁর জাতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন। যে জাতি সত্য গ্রহণে অস্বীকার করবে, তাদের পরিণতিও ঐ জাতিসমূহের মতই হবে। এ সম্পর্কে অবতীর্ণকৃত একটি সূরার নামকরণও 'হূদ' করা হয়েছে। মক্কায় হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি দেখছি, আপনি যেনো বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এর কারণ কি? জবাবে তিনি বলেছিলেন, সূরা হূদ এবং এই সূরার মতো সূরাগুলোই আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

নবী করীম (সাঃ)-এর এই কথা হতে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁর জাতির অবস্থা দেখে তিনি মানসিক অস্থিরতায় এমনভাবে অস্থির ছিলেন যে, যে কোনো মুহূর্তে সেই আযাব এসে গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। মক্কার কুরাইশরা যেভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করছিল, সেই জাতির অবস্থাও ছিল তেমনি। একই অবস্থা সৃষ্টি করার কারণে সেই জাতিকে আল্লাহ ক্ষমা করেননি। কুরাইশদের যদি আল্লাহ অবকাশ না দেন! এদের ওপরেও যদি আযাব আসে! এই চিন্তায় নবী (সাঃ) প্রায় বৃদ্ধের মতো হয়ে পড়েছিলেন।

সূরা হূদে বর্ণিত ইতিহাসে যে কথাটি বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে তাহলো, আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করতে চান, তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই তা করেন। সে ক্ষেত্রে কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও পক্ষপাতিত্ব করা হয় না। কাউকে সামান্য প্রশ্রয় দেয়া হয়না। তখন কে কার সন্তান, কে কার আত্মীয়, এসবের দিকে লক্ষ্য করা হয়না। সে সময় আল্লাহর করুণা কেবল সেই ব্যক্তিই লাভ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করেছে।

আল্লাহর নাযিল করা গযব থেকে এমন নারীও রক্ষা পায়নি, যে নারী ছিল নবীর স্ত্রী। এমন সন্তান রক্ষা পায়নি, যে ছিল নবীর সন্তান। শুধু তাই নয়, সত্য আর মিথ্যার

মধ্যে যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয়, তখন ইসলামের প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই দাবী করে যে, স্বয়ং কোনো মুমিনও যেনো পিতা-সন্তান ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে গিয়ে এবং আল্লাহর ইনসাফের তরবারীর মতোই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। এই ধরণের অবস্থায় রক্ত ও বংশের সম্পর্ক বা আত্মীয়তাকে একবিন্দু গুরুত্ব দেয়া ইসলামের বিপ্লবী ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। মক্কা থেকে যেসব মুসলমান হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন, তাঁরা বদর, ওহূদ এবং যুদ্ধের অন্যান্য ময়দানে এই শিক্ষারই বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন।

ইসলামের সাথেই মুসলিম মিল্লাতের ভাগ্য জড়িত

হযরত হূদ (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে নিজের অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাও। তাঁর দাসত্বের দিকে ফিরে এসো। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের প্রতি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাবেন এবং তোমাদের আরো শক্তি যুগিয়ে তোমাদের বর্তমান শক্তি বৃদ্ধি করবেন, সুতরাং তোমরা অপরাধী হয়ে তাঁর দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখো না।'

ওহীভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ)-ও মানুষকে বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁরই দিকে ফিরে এসো। নিজের জীবনকে তাঁর দাসত্বের অধীন করে দাও। মহান আল্লাহ যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, তা অনুসরণ করো। তাহলে তিনি তোমাদেরকে উত্তম জীবন সামগ্রী দান করবেন। আকাশের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, তোমরা প্রাচুর্যতা লাভ করবে। যমীন তাঁর তলদেশ থেকে সম্পদসমূহ উদগীরণ করে দিবে, তোমরা হবে অভাবশূন্য এবং দারিদ্রতা মুক্ত। উন্নতির স্বর্ণ শিখরে তোমরা পৌঁছাবে।'

পবিত্র কোরআনে এমন কথা একাধিকবার বলা হয়েছে। কোরআনের এই কথা থেকে জানা যায় যে, শুধু কিয়ামতের দিনই নয়, এই পৃথিবীতেও জাতিসমূহের উত্থান পতন সংঘটিত হয় নৈতিক নিয়মের ভিত্তিতে। আল্লাহ এই পৃথিবীর ওপর যে প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কার্যকর করছেন, তা একান্তই নৈতিক বিধানের ওপর ভিত্তিশীল। আল্লাহর এই বিধান নৈতিক ভালো-মন্দের পার্থক্যশূন্য জড়-নিয়মের অধীন নয়। কোরআনে একাধিক স্থানে বলা হয়েছে যে, একটি জাতির কাছে যখন নবীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন বিধান পৌঁছায়, তখন সে জাতির ভাগ্য সেই জীবন বিধানের সাথে জড়িত হয়ে যায়।

এই জীবন বিধান কবুল করলে আল্লাহ্ তার ওপরে নিজের নিয়ামত ও বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। আর যদি সে ঐ জীবন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন। অন্য কথায় আল্লাহ্ মানুষের সাথে যে নৈতিক নিয়মের ভিত্তিতে ব্যবহার করে থাকেন এটা তারই একটি দিক এবং এর আরেকটি দিক হলো, যে জাতি পৃথিবীর স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতার প্রতারণায় পড়ে জুলুম ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে থাকে, একমাত্র ধ্বংসই তার পরিণাম হয়ে থাকে।

আবার ঠিক সে জাতি তার নিশ্চিত ধ্বংসের পরিণতির দিকে ছুটে চলতে থাকে, সেই সময় সে যদি নিজের ভুল অনুভব করতে পেরে এবং বিদ্রোহের পথ ত্যাগ করে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করে, তাহলে আল্লাহ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তাদের জন্য শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে পারেন।

বর্তমানে মুসলিম মিল্লাত যে ধ্বংস গহ্বরের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং এর করুণ পরিণতি সারা দুনিয়াব্যাপী ভোগ করছে, এর একমাত্র কারণ হলো, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান থেকে তারা দূর-বহুদূরে সরে গিয়েছে। ফলে পৃথিবীতে মুসলিম মিল্লাত বর্তমানে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননামূলক জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে।

এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, মুসলিম মিল্লাতের ভাগ্য তথা উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে একটি বিষয়ের ওপর, তাহলো এরা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের সাথে কেমন আচরণ করছে। যদি ইসলামী জীবন বিধানের সাথে এরা উত্তম আচরণ করে, তাহলে পৃথিবীতে তারা সর্বোন্নত শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যখনই এরা ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে, তখনই দাসত্বের আর লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণে বাধ্য হয়েছে।

আল্লাহর আযাবের ধরণ কেমন ছিলো

বছরের পর বছর ধরে, যুগের পর যুগ ধরে সাধারণ মানুষকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকজন বুঝাচ্ছেন, তোমরা ঐসব লোকদের অনুসরণ করো না, যারা নিজেদের নামের পূর্বে প্রগতিবাদী, আধুনিক, সুশীল-সুজন ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে তোমাদের 'ত্রাণকর্তার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এরা শোষক, অহঙ্কারী, ভোগ-বিলাসী, স্বৈরাচার ও উদ্ধত স্বভাবের। এরা নিজেরা যেমন আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে না, তোমাদেরকেও অনুসরণ করতে দেয় না। কিন্তু অধিকাংশ লোকজনই এসব কথা শুনেও শোনে না। তারা সমাজের ঐ সকল অহঙ্কারী, উদ্ধত স্বভাবের ও স্বৈরাচারী প্রকৃতির লোকদের অনুসরণ করে থাকে। হযরত হূদ

(আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থাও এমনি ছিলো। আল্লাহ তা'য়ালা আ'দ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ইতিহাস বর্ণনা করে বলছেন–

وَتِلْكَ عَادٌ، جَحَدُوْا بِايٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ–

এই হচ্ছে আ'দ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, তারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো, তারা তাঁর রাসূলদের নাফরমানী করেছিলো, সর্বোপরি তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ মেনে নিয়েছিলো। (সূরা হূদ-৫৯)

শেষ পরিণতি যা হবার তাই-ই হলো, আল্লাহ তা'য়ালা গযব নাযিল করে সমূলে তাদেরকে ধ্বংস করেদিলেন। পবিত্র কোরআন জানাচ্ছে–

وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ، اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ، اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ–

শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতেও তাদের ওপরে অভিশাপ পতিত হলো এবং কিয়ামতের দিনও। ভালো করে শুনে রাখো, আ'দ সম্প্রদায় তাদের মালিককে অস্বীকার করেছিলো। জেনে রেখো, ধ্বংসই ছিলো হূদের জাতি আ'দের একমাত্র পরিণতি। (সূরা হূদ-৬০)

আল্লাহ তা'য়ালার সিদ্ধান্তকারী আযাব এসে গেলো, শুরু হলো প্রচন্ড ঝড়। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে সে ঝড় আটদিন এবং সাত রাত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল। প্রথম দিন যখন ঝড় শুরু হলো তখন আ'দ জাতির লোকজন তাদের বাড়ি-ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ক্রমশঃ সে ঝড়ের গতি আল্লাহ বৃদ্ধি করতে থাকলেন। প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডব লীলায় বিশাল আকৃতির মানুষগুলো পত্র-পল্লবের মতই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্প্রাণ অসাড় হয়ে পড়েছিল।

মাত্র একদিন পূর্বে যারা তাদের দৈহিক শক্তির কারণে নিজেদেরকে অতুলনীয় ভেবে মহান আল্লাহর বিধানের সাথে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলেছিল, 'কোথায় তোমার আল্লাহর আযাব, যদি পারো তাহলে তা নিয়ে এসে আমাদেরকে দেখাও!' আজ তারা আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হয়ে মৃত পশুর মতই পড়েছিল। তাদের গোটা জনপদের অবস্থা এমন আকার ধারণ করেছিল যে, মাত্র ঘন্টা কয়েক পূর্বেও যে এখানে কোনো

জনপদ ছিল, কোলাহল পূর্ণ মানব বসতী ছিল, তার আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট রইলো না। গোটা নগরী এমনভাবে ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল যে, মানুষ বাসের কোনো চিহ্ন ছিল না। গবেষকগণ অনুমান করেন যে, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হতে পাঁচ হাজার।

এই পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করে যখন কোনো সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায়, তখন যেমন তারা কোনো সাহায্য পায়না তেমনি কিয়ামতের দিনও তারা কোনো সাহায্য পাবে না। এই পৃথিবীতে যেমন তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই জোটে না, পরকালেও তেমনি লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই জুটবে না। আল্লাহ বলেন–

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيَا، وَلَعَذَابُ الاخِرَةِ اَخْزى وَهُمْ لاَيُنْصَرُوْنَ–

তারপর আমি তাদেরকে পৃথিবীর জীবনে লাঞ্ছনামূলক শাস্তির স্বাদ অস্বাদন করানোর জন্য কয়েক দিনব্যাপী তাদের ওপরে মহাশক্তিশালী প্রবল ঝড় প্রেরণ করলাম। আর আখিরাতের পূর্ণ লাঞ্ছনাজনক শাস্তি তো অবশিষ্ট রয়ে গেল। সেখানে তারা কোনো ধরণের সাহায্য পাবে না। (সূরা হা-মীম-সিজ্‌দাহ্‌-১৬)

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আ'দ জাতির ওপরে ধ্বংস নেমে আসার পূর্বে আল্লাহর আযাব মেঘের রূপ ধারণ করে এসেছিল। গোটা আকাশ যখন ভয়ঙ্কর মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল তখন তারা বলছিলো–

هذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا، بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِه، رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ م بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لاَ يُرى اِلاَّ مَسكِنُهُمْ، كَذلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ–

এটা সেই মেঘমালা, এই মেঘমালা আমাদেরকে সিক্ত করে দিবে। (আল্লাহ বলেন) না, এটা সেই জিনিস যার জন্য তোমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে। (অর্থাৎ তারা তো চ্যালেঞ্জ করতো, কোথায় তোমার আযাব? পারলে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো) এটা

প্রলয়ঙ্করী ঝড়, এর মধ্যেই রয়েছে ভয়াবহ আযাব। এই আযাব আল্লাহর নির্দেশে প্রত্যেকটি জিনিষই ধ্বংস্ করে দিবে। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি এমন হলো যে, তাদের থাকার স্থানটুকু ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকি। (সূরা আহ্কাফ-২৪-২৫)

ইসলামের সাথে বেয়াদবি করার কারণে মহান আল্লাহ তাদের যে পরিণতি করেছিলেন, তা পরবর্তী মানুষের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের দুর্দশা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ، مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ–

তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে আ'দ জাতির ঘটনায়। আমি যখন তাদের ওপর সর্ববিধ্বংসী ঝড়ো বাতাস প্রেরণ করলাম তা যে জিনিষের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল, তাকেই পচা হাড়ের মতই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (সূরা যারিয়াহ্-৪১-৪২)

মহান আল্লাহ আ'দ জাতির করুণ পরিণতির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহর দেয়া বিধানের সাথে বিদ্রোহ করলে পরিণতি হয় অত্যন্ত অশুভ। মহান আল্লাহ বলেন–

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ، اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ، تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ–

আ'দ জাতির লোকজন আমার নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তোমরা দেখে নিতে পারো তাদের প্রতি আমার আযাব কেমন কঠোর ছিলো কত সত্য ছিলো আমার সতর্কবাণী। আমি এক বড় ও ক্রমাগত অশুভ দিনে প্রবল ঝড়ো বাতাস তাদের ওপর প্রেরণ করেছিলাম, যা মানুষদের এমনভাবে ছুড়ে ছুড়ে নিক্ষেপ করছিলো, যেনো তা এক একটি মূল হতে উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ড। হ্যাঁ, দেখে নাও কেমন কঠোর ছিলো আমার আযাব আর কতো সত্য ছিলো সতর্ক বাণী। (সূরা ক্বামার-১৮-২১)

প্রচন্ড ঝড়ের দাপটে বিশাল আকারের বৃক্ষগুলো উপড়ে অসহায়ের মতই নেতিয়ে পড়ে থাকে। অথচ ক্ষণপূর্বেও সে বৃক্ষ স্বগৌরবে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দন্ডায়মান ছিল। অহঙ্কারী আ'দ জাতির অবস্থাও তেমনি ছিল। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ، حُسُوْمًا، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى، كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ–

আর শক্তিশালী গোত্র আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝা বাতাসের আঘাতে। আল্লাহ তায়ালা তা ক্রমাগত সাতরাত ও আটদিন পর্যন্ত তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে দেখতে পেতে) দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে এমনভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েছিল যেমন পুরানো শুকনো খেজুর গাছের কান্ডসমূহ পড়ে থাকে। এরপর কি তুমি দেখতে পাও, তাদের একজনও কি এ গযব থেকে রক্ষা পেয়েছে? (সূরা হাক্কাহ-৬-৮)

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আ'দ জাতি স্থাপত্য শিল্পে ছিল অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় পারদর্শী। তাদের একজনের দৈহিক শক্তি ছিলো বর্তমান সময়ের বহুসংখ্যক মানুষের একক শক্তির তুলনায় অনেক বেশী। তারা পাহাড় খোদাই করে নানা ধরনের কিছু সৃষ্টিতে ছিল পারদর্শী। আল্লাহর আইনের সাথে অবাধ্যতা করার কারণে পৃথিবীর বুক থেকে তাদেরকে চরম লাঞ্ছনা দিয়ে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। তাদের মত জাতি আল্লাহর গযবের কাছে টিকে থাকতে পারেনি। বর্তমানেও বিভিন্ন সময় আল্লাহর গযব আসছে। মানব জাতিকে এ ধরনের গযব দিয়ে মহান আল্লাহ সংশোধন করতে চান। অথচ এই নির্বোধ 'সুশীল-সুজন' নামধারী মানুষগুলো এসব গযবকে 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়, 'প্রকৃতির খেয়াল' ইত্যাদী নামে অভিহিত করে। দেশবাসীকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে না বলে উপদেশ দিয়ে থাকে, 'এ সমস্ত বিপর্যয়ের মোকাবেলা করা হবে, কোনো ভয় নেই, সরকার সবকিছু নিয়ে প্রস্তুত আছে।' হতভাগা মানুষ, সাহস কত!

প্রচার মাধ্যমে যখন বারবার ঘোষনা করা হয়, '১০ বা ১২ নম্বর মহাবিপদ সংকেত, ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে।' তখন সরকারের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে জাতিকে তওবা করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ

দেয়ার পরিবর্তে ঘোষনা করে, 'কোনো ভয় নেই, আমরা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।' এই ধরনের ঘোষনা চরম ধৃষ্টতার শামিল। অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আল্লাহর আযাবের মোকাবেলায় কিছুই টিকে থাকে না থাকতে পারে না।

হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর পরিচিতি

হযরত সালেহ (আঃ) ছিলেন মহান আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী। তাঁকে আল হিজর্ নামক এলাকায় সামুদ সম্প্রদায়কে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিলো। উক্ত আল হিজর্ এলাকার বর্তমান নাম মাদায়েনে সালেহ্। আল হিজর্ বা মাদায়েনে সালেহ্ এলাকা আলউলা প্রদেশে থেকে মাত্র বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই এলাকায় সামূদ নামক যে বিশালদেহী মানব সম্প্রদায় আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করার কারণে সমূলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, তাদের ইতিহাস আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত হযরত সালেহ্ (আঃ) এবং তাঁর অবাধ্য জাতির ইতিহাস পঠিত হতে থাকবে এবং শিক্ষা গ্রহণকারীগণ শিক্ষা গ্রহণ করবে। পবিত্র কোরআনে আট স্থানে আল্লাহ হযরত সালেহ (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। সূরা আ'রাফের ৭৩-৭৫ ও ৭৭ নম্বর আয়াতে। সূরা হূদের ৬১-৬২-৬৬ ও ৮৯ নম্বর আয়াতে এবং সূরা শুআ'রার ১৪২ নম্বর আয়াতে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত সালেহ (আঃ)-কে যে জাতির মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে জাতির আদি পুরুষের নাম ছিল সামূদ। এ কারণে এই জাতি ইতিহাসে সামূদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পবিত্র কোরআনেও এই জাতিকে সামূদ জাতি হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ কোরআনে এই জাতি সম্পর্কে ৯ টি সূরায় উল্লেখ করেছেন। সূরা আ'রাফ, সূরা হূদ, সূরা হিজর, সূরা নামল, সূরা ফুস্সিলাত, সূরা নাজম, সূরা ক্বামার, সূরা হাক্কাহ ও সূরা শামস্।

সামূদ জাতির ইতিবৃত্ত

সকল ঐতিহাসিক বর্ণনা একত্রিত করলে প্রমাণ হয় যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর সন্তান সাম-এর বংশধর হলো সামূদ। হযরত নূহ (আঃ)-এর পরবর্তী মানব সম্প্রদায়ের একটি জনগোষ্ঠী আ'দ সম্প্রদায় আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করে আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিলো। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ঈমানদার ছিলো, তাদের ও সমকালীন নবী হযরত হূদ (আঃ)-কে আল্লাহ তা'য়ালা রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ–

শেষ পর্যন্ত আমি নিজের অনুগ্রহের সাহায্যে হুদ এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের বাঁচালাম এবং সেই লোকদের মূলোৎপাটন করে দিলাম যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল এবং যারা ঈমানদার ছিল না। (সূরা আ'রাফ-৭২)

হযরত হূদ (আঃ) যে জনগোষ্ঠী রেখে ইন্তেকাল করলেন, তাদের থেকে পরবর্তীতে যে জনগোষ্ঠী বিস্তার লাভ করেছিল, তাদেরকে ইতিহাসে দ্বিতীয় আ'দ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদেরই একটি শাখা বা গোটা জনগোষ্ঠীকে সামূদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইতিহাসে এ জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা হলো আরবে বায়েদাহ্ বা বিধ্বস্ত আরবী বংশ। গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মতামত হলো, আরবের হিজর নামক এলাকায় এরা বসতী স্থাপন করেছিল।

সামূদ জাতি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতি যা আ'দ জাতির পরে সর্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত ও খ্যাতিমান ছিল। কোরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে এই জাতি সংক্রান্ত কাহিনী গল্পাকারে আরববাসীর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সে যুগের সাহিত্যে, কবিতায় এবং আরবদের কথাবার্তায় এই জাতি সম্পর্কে নানা কথার উল্লেখ দেখা যায়। অসরিয়া প্রস্তর লিপি, গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণও এই জাতির কথা উল্লেখ করে থাকে।

বর্তমানে মদীনা ও তাবুকের মধ্যে রেলপথে 'মাদায়েন সালেহ' নামক একটি ষ্টেশন রয়েছে। এই ষ্টেশনের এলাকা ও তার আশেপাশের এলাকা ছিল সামূদ জাতির কেন্দ্রস্থল। প্রাচীনকালে এই এলাকাকে হিজর বলা হতো। বর্তমান সময় পর্যন্ত

সেখানে কয়েক সহস্র একর এলাকার ওপর সেই পাথুরে কোঠাবাড়িগুলো অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যা সামূদ জাতি তাদের পূর্বপুরুষ আ'দ জাতির অনুকরণে পাহাড় খোদাই করে নির্মাণ করেছিল।

এই প্রাণ স্পন্দনহীন নির্বাক কোলাহল মুক্ত নগরী দেখে অনুমান করা হয় যে, ইতিহাসের গর্ভে নিমজ্জিত সামূদ জাতির জনসংখ্যা খুব কম করে হলেও চার পাঁচ লাখের কম ছিল না। নবী করীম (সাঃ) যখন মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন, তখন আরবের ব্যবসায়ী কাফেলা এই সামূদ জাতির প্রাচীন নিদর্শনসমূহ অতিক্রম করে চলে যেত।

আরবের ঐতিহাসিকগণ বলেন, সামূদ জাতি অট্টালিকা নির্মাণ শিল্পে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল এবং তাদের যুগের অট্টালিকাগুলো তাদের দ্বারাই নির্মিত। হাজরা মাউতবাসীরা দাবী করেন, সামূদ জাতির নির্মাণ শিল্প আ'দ জাতির কারিগরী ও শিল্পবিদ্যার ফলশ্রুতি। নবী করীম (সাঃ) যখন তাবুকের যুদ্ধে যাত্রা করেছিলেন, ফিরে আসার পথে তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে এই শিক্ষামূলক প্রাচীন নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছিলেন। এই সব প্রাচীন নিদর্শনসমূহ থেকে প্রত্যেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরই যে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিত তাই তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন। একস্থানে একটি কূপের চিহ্ন দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, এই কূপ থেকেই হযরত সালেহ (আঃ)-এর উট পানি পান করতো। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, 'তোমরা এই কূপ থেকেই কেবল মাত্র পানি পান করবে। অন্য কোনো কূপ হতে পানি পান করবে না। একটি পাহাড়ী পথ দেখিয়ে তিনি বললেন, এই পথ দিয়েই হযরত সালেহ (আঃ)-এর উট পানি পান করতে আসতো।' এ কারণে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঐ পথটির নাম উটের পথ হিসাবেই পরিচিত রয়েছে।

আল্লাহর গযব যে স্থানে নিপতিত হয়েছিল, সে স্থানে কতিপয় সাহাবা ঘোরাঘুরি করছিলেন। তিনি তাঁদেরকে একত্রিত করে ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, সামূদ জাতির পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এটা সেই এলাকা, যেখানে ছিলো আল্লাহর আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক জাতির বসতী। অতএব এখান থেকে যতদ্রুত সম্ভব বের হয়ে যাও। এটা ভ্রমণের উপযোগী স্থান নয়– এটা হলো কাঁন্নার স্থান।

সামূদ জাতির উত্থান-পতন কাল

পবিত্র কোরআন-হাদীসের বর্ণনা থেকে এ কথা অনুমান করা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এরও বহুপূর্বে পৃথিবীতে সামূদ জাতির উত্থান ও পতন ঘটেছিল। সামূদ জাতি যেখানে ধ্বংস হয়েছিল সেখানে পাথর খোদাই করে নির্মিত কোঠাসমূহের মধ্যে এমন কতকগুলো কবর বর্তমানে আবিষ্কার হয়েছে, সে কবরগুলোর সাথে শিলালিপি রয়েছে। এই শিলা লিপিগুলো আরামী ভাষায় লিখিত। এ কবরগুলো নাবতী সম্প্রদায়ের ঐ সকল ব্যক্তির কবর, যারা সামূদ জাতি ধ্বংস হবার অনেক পরে এখানে এসে বসতী স্থাপন করেছিল। আর আরামী ভাষা হলো পৃথিবীর বহু পুরাতন ভাষা। যে ভাষার কোনো অক্ষর বর্তমানে উদ্ধার করা কঠিন।

ঐ লোকগুলো তাদের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস সংরক্ষণ করার জন্য নিজেদের ফলকের ওপরে আরামী অক্ষরে এমন কোনো তথ্য লিখেছিল, যেন তাদের স্মৃতি রক্ষা করা যায়। সুতরাং এই কবরগুলো সামূদ জাতির কোনো ব্যক্তির নয়। এই জাতি ধ্বংস হবার অনেক পরের। মিসরের বিখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক Zorzizaidan তার নিজের লেখা গ্রন্থ The Arab before Islam নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তিনি লিখেছেন, 'কবরসমূহের নাম ফলক পাঠ করলে যা কিছু প্রকাশ পায় তা হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতির এলাকাসমূহ হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের বেশ পূর্বে নাবতীদের ক্ষমতায় চলে গিয়েছিল। এরা 'বাতরা' নামক স্থানের অধিবাসীদের অন্তর্গত ছিল। তাদের বসবাসের এলাকার চিহ্ন ও টিলাসমূহ প্রাচ্য তত্ত্বানুসন্ধানে আগ্রহী অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক স্বচোক্ষে দেখেছেন। এই সামূদ জাতির পরিচয় পত্র তারা পাঠ করেছেন, যা পাথরসমূহের ওপর খোদিত ছিল। এদের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেই অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ যা 'কাছরে বিন্‌ত, কবরে পাশা, কিলআহ এবং বুরজ নামে অভিহিত। এদের ওপর যা কিছু লিখা হয়েছে তা নাবতী অক্ষরে লিখিত। আর এসবের কোনো কোনোটি অথবা সবগুলো সেই লিখাই যা বিভিন্ন কবরের ওপরে লিখিত বা খোদিত করা হয়েছে।'

প্রাচ্যের গবেষকগণ এখানে গবেষণা করে যা কিছু পেয়েছেন, তার মধ্যে একটি কবর ফলক রয়েছে যা পাথরের গায়ে নাবতী অক্ষরে খোদিত এবং ঈসা (আঃ)-এর জন্মের অনেক পূর্বের লেখা। সেই পাথরের গায়ে লিখা রয়েছে, 'মক্‌রাবা কুম্‌কুম্‌ বিন্‌তে ওয়ায়েলাহ্‌ বিনতে হারাম–অর্থাৎ এবং কুমকুমের কন্যা কলিবাহ যার নাম, তার নিজের ও তার সন্তানের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। এর নির্মাণ কাজ অত্যন্ত

বরকতময় মাসে শুরু করা হয়েছে। এটা সেই সময় যখন নাবতীদের বাদশাহ হারেসের সিংহাসনে আরোহণ করার নয় বছর পূর্ণ হয়। তিনিই সেই হারেস যিনি তাঁর প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।'

কতকগুলো লেখা এমন ছিল যে, তার পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আরেক স্থানে লেখা ছিল, 'লাত, মানাত, আমান্দ ও কায়সের অভিশাপ তার ওপরে যে এই কবরগুলোকে বিক্রি করে দিবে অথবা বন্ধক রাখবে বা কবর থেকে কোনো দেহ বা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বের করবে এবং কুমকুম বা তার কন্যা বা তার সন্তানদের ব্যতীত অন্য কাউকে দাফন করবে। আর যে ব্যক্তিই এর ওপর লিখিত বিষয়ের বিপরীত করবে তার ওপর যুশশরা, হোবল ও মানুতের পাঁচটি অভিশাপ পতিত হবে। আর যে যাদুকর এর বিপরীত করবে তার ওপর এক হাজার হাবশী দিনার জরিমানা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি তার হাতে কুমকুম, কালীবাহ বা তার সন্তানদের মধ্যে কারো হাতের লিপিকা থাকে, যাতে এই আত্মীয়দের কবরের জন্য পরিষ্কার ও স্পষ্ট কথায় অনুমতি দান করা হয়ে থাকে তাহলে জরিমানা হবে না। এই সমাধিস্থান ওয়াহ্‌বুল্লাহ ইবনে উবায়দা নির্মাণ করেছে।'

পবিত্র কোরআন-হাদীসের বর্ণনা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সামূদ জাতি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আগমনের অনেক পূর্বে এই পৃথিবীতে বিচরণশীল ছিল। তাদের ধর্ম বিশ্বাস এবং আদর্শ আ'দ জাতির অনুরূপই ছিল। তাদেরকে এই বাতিল পথ থেকে ফিরিয়ে এনে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করার জন্যই হযরত সালেহ (আঃ) আহ্বান জানাতেন।

অতীত ইতিহাসের উল্লেখ ভীতি সৃষ্টির জন্যে নয়

পবিত্র কোরআন অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস কেনো বর্ণনা করেছে, এ সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করেছি। আ'দ জাতির পরপরই সামূদ জাতির ইতিহাস বর্ণনা করার কারণ হলো, আ'দ জাতিকে ধ্বংস করার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিলো সামূদ জাতিকে এবং তারাও আল্লাহর বিধানের সাথে আ'দ জাতির অনুরূপই আচরণ করেছিলো। ফলে তাদেরকেও আ'দ জাতির অনুরূপ পরিণতি বরণ করতে হয়েছিলো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতীত জাতির ধ্বংসের ইতিহাস এ জন্যেই উল্লেখ করেছেন, মানুষ যেনো এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবনকে আল্লাহর বিধানের অধীন করে দেয়। পিতামাতা তাঁর কলিজার ফুল সন্তানদেরকে সৎপথে

ফিরিয়ে আনার জন্য নানা পথ অবলম্বন করেন। বিভিন্ন ধরণের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝান, যেন সন্তান সৎপথে ফিরে আসে। সন্তানকে তার পিতামাতা ঐ দৃষ্টান্ত পেশ করেন, যারা ভুল পথ অবলম্বন করে নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে দিয়ে এই দৃষ্টান্ত পেশ করার পেছনে পিতামাতার এই উদ্দেশ্য থাকে না যে, তার সন্তান ভীত-সন্ত্রস্ত হোক। বরং তাদের উদ্দেশ্য থাকে সন্তানের কল্যাণ হোক। সন্তান সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে কল্যাণ লাভ করুক।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে ঐ পিতামাতার থেকে অনেকগুণ বেশী ভালোবাসেন। তাঁর কোনো একজন বান্দা শাস্তি ভোগ করুক আল্লাহ্ তা চান না। এ কারণে তিনি তাঁর বান্দার সামনে অতীত জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত পেশ করেন, বান্দাকে বুঝাতে থাকেন, 'এই পথ অবলম্বন করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সুতরাং এই পথ ত্যাগ করে তোমরা নবীর প্রদর্শিত পথে ফিরে এসো।' বান্দার কল্যাণের জন্যই আল্লাহ্ এই দৃষ্টান্ত দান করেন। যেন বান্দা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সহজ সরল পথে ফিরে আসে।

আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করে যারা নিজেদের অকল্যাণ ডেকে এনেছে, তাদের ইতিহাস আল্লাহ্ মানুষকে এ জন্যে শুনিয়েছেন যে, মানুষ যেনো ভুল পথের অনুসরণ করে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল না করে। দুনিয়া এবং আখিরাতে মানুষ যেনো সফলতা অর্জন করে, ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, ওহী অবতীর্ণ করেছেন, কিতাব অবতীর্ণ করে নানা ধরণের দৃষ্টান্ত দিয়ে মানুষকে বুঝিয়েছেন। মানুষ ভুল করবে আর তিনি ক্ষমা করবেন, এ কারণেই তিনি তাঁর সৃষ্টিসমূহের প্রত্যেক পরতে পরতে তাঁর অসীম অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সৃষ্টিসমূহে বিকাশমান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও করুণা সকল মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না বিধায় তিনি তাঁর অবতীর্ণ করা কিতাবের মাধ্যমে নিজ বান্দাকে জানিয়েছেন, 'আমার দয়া অসীম, তুলনাহীন করুণার অধিকারী আমি, বান্দার অপরাধ আমি দেখে থাকি অসীম ক্ষমায়, আমি অনুতাপ ও তাওবা কবুলকারী, আমি ক্ষমাকারী। অপরাধ করেছো, আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করে দিবো। সকল সৃষ্টিকে আমার ক্রোধ পরিব্যপ্ত করেনি, আমার রহমত সকল সৃষ্টিকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছে। তোমার অপরাধ যদি আকাশের উচ্চতা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে আমার রহমত আমার আরশ পর্যন্ত। সুতরাং অতীত ইতিহাস পড়ে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং আমার বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করো। নিজেকে আমার দাসত্বের অধীন করে দাও। তাহলে দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারবে।'

হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর আহ্বান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অমোঘ নিয়ম হলো, যে জাতি বা সম্প্রদায়কে তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করতে চান, সেই জাতির মধ্য থেকেই তিনি এমন একজন মানুষকে নবী-রাসূল নির্বাচিত করেন, যিনি সমকালীন যুগে সকল মানুষের তুলনায় সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী। অপূর্ব সুন্দর চেহারা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, গভীর চিন্তাশীল, বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি, সত্যানুসন্ধিৎসু মন-মানসিকতা, নমনীয় বাচনভঙ্গী, দয়া, ক্ষমা, মায়া-মমতা, উদারতা, ঔদার্য্যতা, ধৈর্য, বিনয়, সততা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি সকল ধরণের সর্বোন্নত গুণ-বৈশিষ্ট্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা শিশুকাল থেকেই ভবিষ্যতের নবী-রাসূলদের জীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ঘটাতে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা শিশুকাল থেকেই হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর মধ্যে সর্বোন্নত সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য দৃশমান করতে থাকেন। নবুয়াত লাভ করার পরে তিনি যখন তাঁর নিজের জাতিকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবেন, তখন কোনো একজন লোকও যেনো তাঁর দিকে আঙ্গুল তুলে বলতে না পারে, তোমার মধ্যে অমুক দুর্বলতা ছিলো। ঠিক এ কারণেই নবী-রাসূলদেরকে যাবতীয় পাপ তথা অপরাধমূলক কর্ম থেকে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হেফাজতে মুক্ত রাখেন। নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ এবং যে কোনো ধরণের অপরাধমুক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন।

হযরত সালেহ্ (আঃ) দেখলেন, তাঁর জাতি যে সকল দুষ্কর্ম এবং অপরাধের সাথে জড়িত, এসব দুষ্কর্ম ও অপরাধের উৎসমুখ মাত্র একটি। সে উৎসমূখ হলো, সমগ্র জগতের সৃষ্টি ও পালনকর্তা আল্লাহকে 'সকল ক্ষমতার উৎস মনে না করা এবং সকল প্রকার দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন না করা।' মানুষ যদি আল্লাহ তা'য়ালাকে একমাত্র 'ইলাহ্ ও রব' হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে সকল সমস্যার উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং সকল শ্রেণীর মানুষ তার মৌলিক অধিকার ইনসাফের সাথে ভোগ করতে পারে।

মানুষ যখনই আপন স্রষ্টা আল্লাহকে শুধুমাত্র ধর্মীয় গন্ডির মধ্যে 'ইলাহ্ ও রব' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে জাতীয় নেতৃবৃন্দ, চিন্তানায়ক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজের দাবীদার লোকদেরকে 'ইলাহ্ ও রব' হিসেবে গ্রহণ করেছে, তখনই জুলুম, অত্যাচার, অনাচার, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন, চরিত্রহীনতা ও অগণিত অপরাধমূলক কর্মকান্ডের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়েছে।

এ কারণে নবী-রাসূলগণ সমস্যার শাখা-প্রশাখার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি, উদ্ভূত সমসাময়িক বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানের জন্যেও আন্দোলন

গড়ে তোলেননি, সমস্যার উৎসমুখে আঘাত করেছেন। তাঁরা জানতেন, সমস্যার উৎসমুখ মাত্র একটি এবং এই উৎসমুখ থেকে অগণিত সমস্যা ছড়িয়ে পড়ে মানুষের জীবন বিষিয়ে তুলছে। সুতরাং সমস্যার এই উৎসমুখে অর্গল তুলে দিতে হবে। এ কারণেই প্রত্যেক নবী-রাসূল নিজ জাতির প্রতি আহ্বানের সূচনাতে যে কথা বলেছেন, হযরত সালেহ্ (আঃ)-ও সেই চিরসত্য কথাটির মাধ্যমেই নিজ জাতিকে আহ্বান জানালেন–

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا م قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ–

এবং সামূদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই সালেহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাঁর জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। (সূরা আ'রাফ-৭৩)

উল্লেখিত আয়াতে 'আখাহুম সালিহা' অর্থাৎ তাদেরই ভাই সালেহ্– শব্দসমূহ ব্যবহার করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, হযরত সালেহ্ (আঃ) অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না। তিনিও সেই সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন, যে সম্প্রদায় অগণিত অপরাধমূলক কাজ নির্বিঘ্নে করে যাচ্ছিলো। তিনি বাইরের কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ ছিলেন না বা বিদেশীও ছিলেন না। তিনি সেই সমাজে দীর্ঘ চল্লিশ বছর জীবনকাল অতিবাহিত করেছেন এবং সমাজের প্রত্যেকটি সমস্যাকে খুবই কাছ থেকে দেখে সমস্যার মূল উৎসমূখ নির্ণয় করে তা সমাধানের লক্ষ্যে জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সকল সমস্যার উৎসমুখ

এ কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, হযরত সালেহ্ (আঃ) কোন্ সম্প্রদায়ের কাছে নবী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পবিত্র কোরআন থেকে এ কথাও জানা যায় যে, উক্ত সম্প্রদায়ের নয়জন নেতা ছিলো এবং এই নয়জন নেতার নেতৃত্বেই গোটা সম্প্রদায় পরিচালিত হতো। আর এই সুযোগেই নেতৃবৃন্দ সাধারণ জনগণকে শোষন করার কায়েমী ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছিলো। নেতা গোছের এই নয় ব্যক্তিই ছিলো সকল ক্ষমতার উৎস এবং নিজেদের জুলুমমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখার স্বার্থেই তারা সামূদ জাতিকে মূর্তি পূজার দিকে ঠেলে দিয়েছিলো।

বর্তমান সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক চিন্তা-গবেষণার আবিষ্কার যদি নির্ভুল হয়ে থাকে, তাহলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর সমাজের জনগণের মধ্যে শির্ক একটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূর্তি পূজা সমন্বিত আরাধনা-উপাসনার সমষ্টিই শুধু ছিল না, বরং তা ছিল সেই জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনাদর্শের ভিত্তি। হযরত সালেহ্ (আঃ) এসবের মোকাবেলায় এক নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করেছিলেন।

এই দাওয়াতের আঘাত শুধুমাত্র মূর্তি পূজার ওপর পড়েনি, নয়জন নেতার পূজ্য আসনে আসীন হওয়া, সার্বভৌমত্ব লাভ এবং পূজারী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা তথা সমগ্র দেশের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার ওপরও প্রত্যক্ষ আঘাত পড়েছিল। হযরত সালেহ (আঃ)-এর আদর্শ গ্রহণ করার অর্থ নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত শিরক-ভিত্তিক গোটা সমাজ-প্রাসাদকে চূর্ণ করে দিয়ে এবং তা নতুন করে ইসলামের তাওহীদের ভিত্তির ওপর পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা।

এ কারণেই হযরত সালেহ্ (আঃ) যখন এক আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন সে সমাজের সকল জনগণ ও বিশিষ্ট লোকজন এবং পূজারীসহ সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা শুরু করেছিল তাওহীদের এই আহ্বানকে কিভাবে স্তব্ধ করা যায়। কারণ নেতা গোছের উক্ত নয় ব্যক্তি ও পূজারীগণ দেবতার নাম ভাঙ্গিয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছিল। সাধারণ মানুষের চোখের ওপরে যে পর্দা পড়েছিল, হযরত সালেহ (আঃ) তা সরিয়ে দিচ্ছিলেন। ফলে নেতৃবৃন্দ ও পূজারীগণ অর্থাৎ ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী চরম বিরোধিতা শুরু করেছিল।

সামূদ জাতির নেতাগণ ও তাদের সহযোগিবৃন্দ অনুধাবন করেছিল, সালেহ্ নামক লোকটির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। হযরত সালেহ্ (আঃ) যখন নবী হিসেবে তাদের সামনে নিজেকে পেশ করেছিলেন, তখন নবী আগমনের উদ্দেশ্য কি এবং নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষের প্রতি কোন্ ধরনের দায়িত্ব অর্পিত হয় এ কথা তারা বুঝেছিল। তারা অনুধাবন করেছিল, রাসূল বা নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে– এতেই মানুষের দায়িত্ব শেষ হয় না। নবীকে বিশ্বাস করবে সেই সাথে মানুষ অন্য কারো আইন মেনে চলবে বা নিজের ইচ্ছানুসারে জীবন যাপন করবে, এটা সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ নবী বা রাসূল প্রেরণ করেননি। বরং নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো, জীবন যাপনের জন্য যে বিধান তিনি নিয়ে আসেন, পৃথিবীর সকল বিধান ত্যাগ করে কেবলমাত্র

সেই বিধান অনুসরাহে জীবন যাপন করতে হবে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূল যে নির্দেশ দিবেন, পৃথিবীর সকলের নির্দেশ ত্যাগ করে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হবে।

এটাই হলো রাসূলকে রাসূল এবং নবীকে নবী বলে স্বীকৃতি দেয়ার স্পষ্ট অর্থ। নবী-রাসূলদেরকে স্বীকৃতি দিবে, অপরদিকে মানব রচিত আইন অনুসরণ করবে, মানব রচিত মতবাদ মতাদর্শ দেশে বাস্তবায়ন করার আন্দোলন করবে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিমালা অনুসরণ করবে, এ অবকাশ আল্লাহ্ দেননি। যারা এ নীতি অনুসরণ করে, তারা যে স্পষ্ট মুনাফিক এবং আল্লাহর দ্বীনের মারাত্মক শত্রু এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের আরো একটি দায়িত্ব হলো, তাঁরা আল্লাহর নাযিল করা বিধান পৃথিবীর সকল মতবাদ মতাদর্শের ওপরে বিজয়ী করবেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল আদর্শ, মতবাদ, মতাদর্শ, আইন-কানুনের মোকাবেলায় ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। ইসলাম রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে দেশ বা পৃথিবী শাসন করবে।

নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করে মানব রচিত সকল মতবাদ মতাদর্শকে পরাজিত করে আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করবেন। পৃথিবীর সকল আইন থাকবে আল্লাহর বিধানের অধীনে। এ বিধান প্রচলিত কোনো আইনের অধীনে থাকবে না বা এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে আসেনি। মানব রচিত আইনের অধীনে এই বিধান সামান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে টিকে থাকবে, এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁর বিধান নাযিল করেননি।

পৃথিবীর সকল প্রকার মতবাদ মতাদর্শ আল্লাহর বিধানের অনুগ্রহ কুড়িয়ে টিকে থাকার হলে টিকে থাকবে আর না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহর বিধান যিনি নিয়ে আসেন, তিনি পৃথিবী ও আকাশের বাদশাহ তথা অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালীর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন। নবী-রাসূলগণ সৃষ্টি জগতের বাদশাহ মহান আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী দেখতে চান। পৃথিবীতে যদি কোন মতবাদ টিকে থাকার মতো হয়, তাহলে আল্লাহর বিধানের দেয়া সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেই টিকে থাকতে হবে। এই বিধানের মোকাবেলায় পৃথিবীতে অন্য কোনো বিধান মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এমন কোনো বিধানের অস্তিত্ব থাকবে না। নবী-রাসূলদের আহ্বানের এটাই হলো মূল কথা। এই কথাগুলো সামূদ সম্প্রদায়ের নয়জন উপদেষ্টা ও পূজারীগণ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল।

হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর সাথে 'ইলাহ্' নিয়ে উক্ত নেতা গোষ্ঠের নয় ব্যক্তি ও তাদের অনুসারীদের বিতর্ক হয়েছে। এই বিতর্ক শুধু তাঁর সাথেই হয়নি। প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের সাথেই 'ইলাহ্' নিয়েই সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে এবং নবী-রাসূলের অবর্তমানে প্রত্যেক যুগে ইসলামী আন্দোলনের সাথে 'ইলাহ্' নিয়েই সমকালীন শক্তির সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে বহুস্থানে 'ইলাহ্' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর 'উলুহিয়াত' সম্পর্কে মানুষ চিরকালই ভুল ধারণা পোষণ করেছে। মানুষ আল্লাহকে 'ইলাহ্' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সত্য কথা, কিন্তু তা শুধু আল্লাহর স্রষ্টা হবার ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেছে। এই হিসেবে আল্লাহ্ অবশ্যই 'ইলাহ্'। এ কথা প্রত্যেক নবী-রাসূলদের জাতিগণ স্বীকার করেছে।

কিন্তু তারা আল্লাহকে বিধানদাতা হিসেবে অর্থাৎ জীবন পরিচালনা ও জীবন ব্যবস্থা প্রনয়ণের ক্ষেত্রে 'ইলাহ্' হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি বর্তমানেও রাজী নয়। এখনও বলা হচ্ছে, আল্লাহ অবশ্যই 'ইলাহ্'। কিন্তু তা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে । আইনদাতা, বিধান দাতা, আইন রচয়িতা হিসেবে তিনি 'ইলাহ্' নন। এ সকল ক্ষেত্রে মানুষই স্বয়ং সম্পূর্ণ। আল্লাহ 'ইলাহ্' হিসেবে থাকবেন ধর্মীয় উপাসনালয়ে। চার দেয়ালে পরিবেষ্টিত ধর্মীয় উপাসনালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রের বাইরের জগতে আল্লাহ 'ইলাহ্' নন। এই প্রশ্নেই ইসলামপন্থীদের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়। কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালাকে 'ইলাহ্' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মেনে না নেয়াই হলো সকল সমস্যার উৎসমুখ।

নিজ জাতিকে সংশোধনের প্রচেষ্টা

হযরত সালেহ্ (আঃ) নিজের সম্প্রদায় সামূদ জাতিকে বুঝালেন, 'তোমরা ইলাহ ও রব ধারণা করে যাদের পূজা করছো, তারা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালাই হলেন মানুষের একমাত্র ইলাহ্ ও রব। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এখানেই তোমাদেরকে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের খুবই কাছে রয়েছেন এবং তাঁর কাছে যারা প্রার্থনা করেন, তিনি তাদের প্রার্থনা কবুল করেন। তোমরা দীর্ঘদিন যাবৎ সেই আল্লাহর দাসত্ব ত্যাগ করে যে অপরাধ করেছো, এ জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও এবং নিজেদেরকে তাঁর দাসত্বের অধীন করে দাও।' এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًام قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُه، هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ، اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ-

আর সামূদ-এর কাছে আমি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করলাম। সে বললো, হে জাতির লোকজন! আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন আর এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকেই ফিরে এসো। অবশ্যই আমার রব অত্যন্ত কাছে এবং তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দান করেন। (সূরা হূদ-৬১)

হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা কেনো আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবে না, তোমরা যার আইন কানুন অনুসরণ করছো তাদের তো কোনই শক্তি নেই। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যমীনের নিষ্প্রাণ জড়-বস্তুর সংমিশ্রণে এই মানবীয় অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে এই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনিই তোমাদের জীবন ধারনের যাবতীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করছেন। তাহলে তাঁর বিধান ব্যতীত আর কার বিধান এই যমীনে কার্যকর হতে পারে? তিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের উপযুক্ত সত্ত্বা আর কে থাকতে পারে?

সুতরাং তোমরা এতদিন তাকে ত্যাগ করে অন্যান্য শক্তির দাসত্ব করেছো, এ কারণে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। তিনি অত্যন্ত মেহেরবান। তাঁর কাছে যে প্রার্থনা করে তিনি তাঁর প্রার্থনা শোনেন। তিনি প্রার্থনা শুনে নীরব থাকেন না। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় তিনি সাড়া দেন। সুতরাং তাঁর কাছে নিজেদের অতীত কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব না করে অন্যান্য শক্তিরও দাসত্ব করে, আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণা একটু ভিন্ন ধরণের। এই ভিন্ন ধারণাই তাদেরকে বিরাট এক ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে এবং তারা শির্কে লিপ্ত রয়েছে। এই শ্রেণীর লোকগুলোর বিশ্বাস হলো, মহান আল্লাহ হলেন এই পৃথিবীর রাজা-বাদশা এবং সম্রাটদের মতই। পৃথিবীর শাসকরা যেমন দেশের সাধারণ

জনগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বহুদূরে রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করে ভোগ বিলাসে মাতোয়ারা হয়ে থাকে, সাধারণ মানুষের পক্ষে যেমন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না, তাদের সামনে যাওয়ার সুযোগ থাকে না, তাদের কাছে দরখাস্ত প্রেরণ করতে হলে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, সৌভাগ্যবশত কারো দরখাস্ত যদি শাসকদের কাছে পৌছে যায় তবুও শাসকগণ সে দরখাস্তের আবেদন সম্পর্কে স্বয়ং কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কোনো কর্মচারীকে বা নিজের অধীনস্থ কাউকে দায়িত্ব প্রদান করেন যে, আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করা যায় কিনা তা দেখা হোক। এক শ্রেণীর মানুষ মহান আল্লাহকেও পৃথিবীর এই শাসকদের মতই মনে করেছে এবং এর ফল হয়েছে অত্যন্ত মারাত্মক।

এক শ্রেণীর ধুরন্ধর মানুষ তখন উল্লেখিত ভ্রান্ত ধারণা অনুসরণকারী মানুষদের বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে, সকল শাসকের শাসক, সম্রাটের সম্রাট আল্লাহ্ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন। সাধারণ মানুষের নাগাল হতে তিনি বহুদূরে রয়েছেন। একজন সাধারণ মানুষের আবেদন সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌছে না। আল্লাহর কাছে সাধারণ মানুষের প্রার্থনা পৌছা এবং তার জবাব পাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

আল্লাহর কাছে কোনো প্রার্থনা পেশ এবং তার জবাব পেতে হলে কি করতে হবে? ওসীলা অনুসন্ধান করতে হবে। পবিত্র কোরআনের সূরায়ে মায়েদার ৩৫ নম্বর আয়াতের অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিল, আল্লাহর কাছে কোনো প্রার্থনা পৌছাতে হলে অবশ্যই কোনো না কোনো ওসীলা ধরতেই হবে। সে ওসীলার ধরণ কেমন? এই ওসীলার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিভিন্নজনে নানা ধরণের ওসীলা বের করে সাধারণ মানুষকে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রেখে শোষণের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

কেউ বললো, ওসীলা মানে হলো ঐ সকল পবিত্র আত্মা যারা পৃথিবীতে আল্লাহর ওলী ও কামেল ছিলেন। জীবিত থাকতে তাঁরা যেমন ছিলেন ওসীলা এবং ইন্তেকালের পরে তাদের মাজারই হলো সেই ওসীলা। মাজারে গিয়ে সিজদা দিয়ে বা হাত তুলে হোক, মাজারে শায়িত ব্যক্তির কাছে আবেদন করতে হবে, তিনি যেন আল্লাহর কাছে তার দরখাস্ত পৌছে দেন। মাজারে শায়িত ব্যক্তি তো আর শূন্য হাতে আল্লাহর কাছে

তোমার দরখাস্ত পৌঁছাবেন না। পৃথিবীর কোনো শাসকের কাছের কোনো লোক শূন্য হাতে যেমন কোনো আবেদন পৌঁছায় না– বিনিময় দিতে হয়, তেমনি এই মাজারেও নজর-নেওয়াজ দিতে হবে। তাহলে তোমার আবেদন তিনি আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবেন।

সে বিনিময়ের ধরণ হলো, নগদ অর্থ থেকে শুরু করে পৃথিবীর নানা বস্তুও হতে পারে। হতে পারে তা মুরগী, উট, গরু, ছাগল বা গাছের ফল ইত্যাদি। এসব জিনিস বা নগদ অর্থ মাজারে মানত দিতে হবে। তাহলে তিনি তোমাদের আবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবেন। এসব মানত মাজারের সেবক যারা আছেন তারা ভোগ করবেন। মাজারের সেবকদের ভোগ করার অর্থই হলো মাজারে শায়িত ব্যক্তির ভোগ করা।

আরেক শ্রেণীর কৌশলী লোক ওসীলা বলতে কি বুঝায় তা এভাবে বুঝিয়ে দিল, যারা ওসীলা বলতে মাজারে শায়িত ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে, তারা আসলে ধান্দাবাজ এবং ওরা ধান্দাবাজি করে তোমাদের অর্থ-সম্পদ নিজের পকেটস্থ করতে চায়। তোমাদের পশু সম্পদ ও গাছের ফলমূল খেতে চায়। কারণ মাজারে যিনি শুয়ে আছেন তিনি মৃত। আর মৃত মানুষ কি কোনো কিছু খেতে পারে? তাহলে তোমরা কেনো মৃত মানুষের কবরে এসব জিনিস দান করো? অর্থই বা কেনো দাও? মৃত মানুষের তো নগদ অর্থের প্রয়োজন নেই, অর্থ প্রয়োজন জীবিত মানুষের।

সুতরাং ওসীলা হলো নাদুস নুদুস নূরানী চেহারার অধিকারী পীর নামক ব্যক্তিগণ। তাদের সাথে মহান আল্লাহর নিবিড় সম্পর্ক। তিনি তোমার যে কোনো আবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবেন। পীরের মুরীদ হও এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখো। তিনি তোমার প্রতি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখবেন।

আরেক শ্রেণীর চতুর লোক বললো, এসব পীর মাজার সব কিছুই বাতিল, এরা ওসীলা নয়। প্রকৃত ওসীলা হলো, নিজের হাতে মাটি বা অন্য কিছু দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করতে হবে বা কোনো মূর্তির ছবি অঙ্কন করতে হবে। তারপর সেই মূর্তির সামনে দু'হাত ভরে দান করতে হবে। তবে এই দানের কাজও তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের সামনে কোনো কিছু দান করার অধিকার আমাদের, কারণ আমরা তাদের প্রতিনিধি। তোমরা আমাদের কাছে দান পৌঁছে দেবে, আমরা তা পৌঁছে দেবো মূর্তির সামনে। তিনি তা পৌঁছে দেবেন স্বয়ং স্রষ্টার কাছে।

প্রত্যেক যুগে ধুরন্ধর শ্রেণীর মানুষ ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে এভাবেই ভুল পথে পরিচালিত করেছে। আল্লাহ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হবার ফলে বান্দা ও আল্লাহর মাঝখানে অসংখ্য ছোট বড় রব, ইলাহ্, মাবুদ ও সুপারিশকারীর এক বিশাল দল নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। সেই সাথে পাদ্রী ও পুরোহিত তন্ত্রের একটি বাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যাদের মাধ্যম ব্যতীত জাহেলী ধর্মের অনুসারীরা তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করতে পারে না।

হযরত সালেহ (আঃ) জাহিলিয়াতের এই বিরাট গোলক ধাঁ-ধাঁকে মাত্র দুটো কথার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাদের অত্যন্ত কাছে অবস্থান করছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি তোমাদের আবেদনের জবাব দেন। অর্থাৎ আল্লাহকে দূরে অবস্থিত মনে করা অত্যন্ত ভুল। তাঁকে সরাসরি ডেকে নিজের আবেদন পেশ করা যাবে না– এ ধারণাও ভুল। যদিও তিনি বিরাট উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তোমাদের অত্যন্ত কাছে।

তোমাদের প্রত্যেকেই তাঁকে খুবই কাছে পেতে পারে। তাঁর কাছে গোপনে, প্রকাশ্যে, নীরবে, উচ্চকণ্ঠে, দলবদ্ধভাবে, একাকী, নির্জনে, যে কোনো স্থানে নিজের আবেদন-নিবেদন পেশ করা যেতে পারে। তাঁর কাছে আবেদন করতে হলে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয়না। তিনি সরাসরি আবেদন গ্রহণ করেন এবং জবাব দেন। এমনকি তাঁর কাছে যদি মনে মনে আবেদন করো, তবুও তিনি তা মঞ্জুর করেন। সুতরাং তিনিই তোমাদের ইলাহ্ এবং রব, তাঁরই দাসত্ব করো। তাঁর কাছেই সরাসরি আবেদন করো। তাঁর দাসত্ব ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করো না। কারণ তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস।

আমাদের মধ্যে তুমিই ছিলে সবথেকে সৎ মানুষ

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শিশুকাল থেকেই নবী-রাসূলদের প্রকৃতি কেমন হয়ে থাকে। সর্বোন্নত স্বভাব-প্রকৃতির কারণে নবুয়াত পূর্ব জীবনে তাঁরা বর্বর সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের কাছেই মহাসম্মানিত একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবেই পরিচিত থাকেন। কিন্তু যখনই সেই মহাসম্মানিত ব্যক্তি সমাজের বর্বর লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান, তখনই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ ও জ্ঞানী মানুষটিই তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর জবাবে তাঁর জাতির লোকজন বলেছিলো–

قَالُوْا يصلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذَا اَتَنْهنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ابَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ–

তারা বললো, হে সালেহ! পূর্বে তুমি আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার সাথে অনেক আশা-আকাংখাই জড়িত ছিল। তুমি কি আমাদেরকে ঐ সব ইলাহদের দাসত্ব করা হতে বিরত রাখতে চাও, যাদের দাসত্ব আমাদের বাপ-দাদারা করেছে? তুমি আমাদেরকে যেদিকে ডাকছো, সে সম্পর্কে আমাদের মনে বড় সন্দেহ হচ্ছে, এসব আমাদেরকে বড় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। (সূরা হূদ-৬২)

হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বলেছিল, 'আমাদের মধ্যে তুমি ছিলে সবচেয়ে সৎ এবং জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির অধিকারী। আমরা আশা করে ছিলাম তোমার সত্যতা, জ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা আমরা উপকৃত হবো। কিন্তু এখন যে কি পাগলামীতে তোমাকে পেয়ে বসলো, তুমি হঠাৎ দাবী করে বসলে যে তুমি নবী। তোমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। সেই ওহী অনুযায়ী আমাদেরকে চলতে হবে এবং না চললে আমাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।'

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই একই কথা নবী করীম (সাঃ)-কে আরবের লোকজন বলেছিল। তারা বলেছিল, তুমি একজন সৎ ব্যবসায়ী। গোটা আরবের মধ্যে তুমি ছিলে সবথেকে চরিত্রবান। তোমার সত্যতা সর্বজন বিদিত। আমাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলে। আমরা ধারণা করেছিলাম, আমাদের জাতি তোমার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ও যোগ্যতা দ্বারা উন্নতি করতে পারবে। এখন দেখছি

তোমাকে অদ্ভুত এক পাগলামীতে পেয়েছে। এসব তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের কথা বলে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতও শেষ করলে আমাদেরকেও ধ্বংসের পথের দিকে ডাকছো।

পবিত্র কোরআনে এ কথা বহুস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এক শ্রেণীর লোকজন আল্লাহর দরবারে গ্রেফতার হবার পরে বলবে, হে আল্লাহ! শুধু আমাদেরকে শাস্তি দিও না, যাদের কারণে আমরা তোমার দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে পারিনি, তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করো।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ، وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ، رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا–

সেদিন তাদের চেহারাসমূহ ওলট-পালট করে প্রজ্জ্বলিত আগুনে রাখা হবে, সেদিন তারা আফসোস করে বলবে, হায়! কতো ভালো হতো যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আসতাম। তারা সেদিন আরো বলবে, হে আমাদের রব! দুনিয়ার জীবনে আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের অনুসরণ করেছি এবং তাদের কথাই মেনে চলেছি, তারাই আমাদের তোমার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। হে আমাদের মালিক! ওদের তুমি আজ দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর বড়ো রকমের অভিশাপ পাঠাও। (সূরা আহযাব-৬৬-৬৮)

অর্থাৎ আমরা আমাদের বাপ-দাদার পথ অনুসরণ করেছি, আমাদের নেতৃবৃন্দ যে পথে চলতে বলেছে আমরা সেই পথেই চলেছি। সুতরাং আমরা যে শাস্তি পাচ্ছি এরচেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি তাদেরকে দাও।

সে যুগেও মানুষ বলতো, আমরা বাপ-দাদাকে যে পথে চলতে দেখেছি সেই পথ ত্যাগ করতে পারি না। প্রত্যেক নবী-রাসূলদের যুগে এ কথা বলা হয়েছে। বর্তমানেও বলা হয়, আমার বাপ-দাদা অমুক দলের প্রতি সমর্থন দিয়েছে, অমুক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করেছে। অমুক মাজারের ভক্ত এবং অমুক পীরের মুরীদ ছিলেন। সুতরাং তারা তো আর ভুল করেননি, তারা যা করে গিয়েছেন আমরাও তাই-ই করবো।

আর এসব কিছুই হলো পথভ্রষ্ট হবার মূল কারণ। কে কি করেছেন এবং কোন্ পথে চলেছেন, এসব অনুসরণ না করে আল্লাহর কিতাব মানুষকে যে পথের দিকে আহ্বান জানায়, সে পথ অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আ'দ জাতির ইতিহাস স্মরণ করো

সামূদ জাতি যে ধরণের অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত, সেই একই ধরণের অপরাধের কারণে ইতোপূর্বে আ'দ জাতির প্রতি মহান আল্লাহর আযাবের চাবুক হানা হয়েছিলো, এ কথা সামূদ জাতির অজানা ছিলো না। কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া সেই আ'দ জাতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হযরত সালেহ্ (আঃ) নিজ জাতি সামূদকে বলেছিলেন–

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاَكُمْ فِى الاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا، فَاذْكُرُوْا الاَءَ اللّٰهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ–

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ আ'দ জাতির পরে তোমাদেরকে এই যমীনে স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন এবং পৃথিবীতে তোমাদের এই মর্যাদা দান করেছেন যে, আজ তোমরা এই যমীনের সমতল ভূমির ওপরে সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করছো ও এর পর্বত গাত্র খোদাই করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করছো। সুতরাং তোমরা আল্লাহর এসব জ্ঞান ও প্রকৌশল সংক্রান্ত নিয়ামত স্মরণ করো এবং কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় ঘটিয়ো না। (সূরা আ'রাফ-৭৪)

সামূদ জাতির উৎকর্ষতা সম্পর্কে গবেষকগণ বলেন, তাদের শিল্প-কর্ম প্রাচীন ভারতের ইলোরা, অজান্তা ও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত শিল্পকার্যের সাথে তুলনীয়। তারা পর্বত খোদাই করে তার মধ্যেই বড় বড় সমুচ্চ ও প্রকান্ড ইমারত তৈরী করেছিল। মাদায়েনে সালেহ এলাকায় এখন পর্যন্ত তাদের কোঠাবাড়িগুলো অক্ষত অবস্থায় বর্তমান কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এসব নিদর্শন দেখে সামূদ জাতির প্রকৌশল বিদ্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। পাহাড় খোদাই করে নির্মিত ঘরগুলোর মধ্যে আমি নিজে প্রবেশ করেছি, আমি বিস্মিত হয়েছি আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সামূদ জাতির শিল্পকর্ম দেখে।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সাধারণ কোনো কাজ যথাযথভাবে করার জন্যে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। এসব যন্ত্র ব্যতীত কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়। বিশাল ওজনের কিছু স্থানান্তরিত করা বা নীচ থেকে ওপরে উঠানোর জন্যে ক্রেন আবিষ্কার করা হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত বহুতল বিশিষ্ট ভবনসমূহ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম স্ক্রু জোড়া দেয়ার জন্যেও স্ক্রু-ড্রাইভার আবিষ্কার করে কাজে লাগানো হচ্ছে।

অথচ বিশাল আকৃতির পাথুরে পাহাড় এমন নিপুণভাবে কেটে ঘর-বাড়ি এবং ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র রাখার জন্যে দেয়াল আলমারী বানানো হয়েছে কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করে? ইট, কাঠ, পাথর, লোহা বা অন্য কোনো ধাতব বস্তু মসৃণ করার জন্যে বর্তমানে কত ধরণের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু আ'দ ও সামূদ জাতি কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করে এব্ড়ো-থেব্ড়া অসমতল পাথুরে পাহাড় কেটে দৃষ্টিনন্দন আকৃতি দিয়েছে কিভাবে? এসব দৃশ্য দেখলে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, উক্ত জাতির প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালা অবারিত হস্তে নিয়ামত দান করেছিলেন।

হযরত সালেহ্ (আঃ) তাঁর জাতি সামূদকে আ'দ জাতির কাহিনী শুনিয়ে সাবধান করেছিলেন, তাদের থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। যে আল্লাহর অসীম কুদরাত ঐ বিপর্যয়কারী জাতিটিকে ধ্বংস করে তাদের স্থানে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করেছেন, সেই আল্লাহই তোমাদেরকে ধ্বংস করে অন্য লোকদেরকে তোমাদের স্থালাভিষিক্ত করতে পারেন, যদি তোমরাও আ'দ জাতির মত আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করো।

তুমি যে সত্যই নবী তার প্রমাণ দাও

হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর জাতিকে বারবার ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। মানব রচিত আদর্শ ত্যাগ করে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সেই জাতির মূঢ় নয়জন নেতা জাতিকে নিষেধ করেছিল, তারা যেন আল্লাহর নবীর কথার প্রতি মনোযোগ না দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা সেই নয়জন নেতার কর্মকান্ড সম্পর্কে বলেছেন–

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ-

সে শহরে নেতা গোছের এমন নয়জন লোক ছিলো, যারা আমার যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াতো। সংশোধনমূলক কোনো কাজই তারা করতো না। (সূরা আন নামল-৪৮)

এরপরেও কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর নবীর আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করে নবীর সহযোগী হয়েছিল। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ امَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ، قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ، قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِيْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ–

তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ– যারা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব করছিল, দুর্বল শ্রেণীর ঈমানদার লোকদেরকে বলেছিল, তোমরা কি সত্য সত্যই জানো যে সালেহ্ আল্লাহর প্রেরিত নবী? তাঁরা উত্তরে বলেছিল, অবশ্যই যে পয়গামসহ সে প্রেরিত হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি ও অনুসরণ করি। এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার লোকগুলো বলেছিল, তোমরা যা মেনে নিয়েছো আমরা তা অস্বীকার করি। (সূরা আ'রাফ-৭৫-৭৬)

সামূদ জাতির নেতা এবং তাদের অনুসারীগণ আল্লাহর নবীকে বিদ্রুপ করে বলতো, আমরা যদি আল্লাহর অপসন্দনীয় পথেই চলতাম এবং আল্লাহ যদি আমাদেরকে পছন্দ না-ই করতেন তাহলে তিনি আমাদেরকে এই বিশাল শান-শওকাত দিয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছে দিতেন না। বরং আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার যে কয়জন অনুসারী আছে তাদেরকেই পসন্দ করেন না। এ কারণেই তিনি তোমাদের কোনো ধন-দৌলত দান করেননি। এই জাতির মধ্যে তোমরা সবথেকে গরীব। এই সমাজে তোমাদের কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে কে সত্য পথে আছে আর কে মিথ্যার অনুসারী।

হযরত সালেহ (আঃ) সমাজের এই নেতৃস্থানীয় লোকগুলোর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে তাদেরকে বলতেন, এসব ধন-দৌলতের সাথে আল্লাহর পাসন্দ অপসন্দের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি কোন্ ব্যক্তিকে সম্পদ দান করবেন আর

কাকে দান করবেন না, এটা সম্পূর্ণ তাঁর ইখতিয়ারে। তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পদ এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এ কারণে তোমাদের তো উচিত ছিলো শোকর হিসেবে আল্লাহর দাসত্ব করা। তোমরা তা না করে আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করছো।

সামূদ জাতির নেতৃবৃন্দ ধারণা করতো কোনো মানুষকে যদি নবীই নির্বাচিত করা হয়ে থাকে, তাহলে সমাজে যারা নেতৃস্থানীয়, ধন-সম্পদ ও সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে তাদেরকেই নবী হিসেবে নির্বাচিত করা হবে। এ জন্য তারা বলতো, আমরা জীবিত থাকতে এই লোকটির ওপরে আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয় কি করে? এভাবে তারা নানা কথা বলে অবশেষে দাবী করলো, তুমি যদি সত্যই আল্লাহর নবী হয়ে থাকো তাহলে মুজিযা দেখাও।

মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত এই পৃথিবীতে কোনো একটি প্রাণীর পক্ষেই এক মুহূর্ত টিকে থাকা সম্ভব নয়, এ কথা মানুষের কাছে খুবই স্পষ্ট। তবুও এই মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করে না। আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহের মধ্যে মাত্র কয়েকটি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর জাতিকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ، اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صلِحٌ اَلاَتَتَّقُوْنَ، اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ، فَاتَّقُوْا اللّهَ وَاَطِيْعُوْنَ، وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ، اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلي رَبِّ الْعلَمِيْنَ، اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا ههُنَا امِنِيْنَ، فِىْ جَنّتٍ وَّعُيُوْنٍ، وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ، وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فرِهِيْنَ، فَاتَّقُوْا اللّهَ وَاَطِيْعُوْنَ، وَلاَ تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ، اَلَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ، قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ، مَا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا، فَاْتِ بِايَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّدِقِيْنَ–

সামূদ জাতি পয়গম্বরদেরকে মিথ্যা প্রতিপাদন করেছিল। যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের প্রতি সত্যনিষ্ঠ

পয়গম্বর। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো। আর আমি এই কাজের জন্য (আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছানের জন্য) তোমাদের কাছ থেকে কোনো বিনিময় দাবী করছি না। আমার বিনিময় তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাতে রয়েছে। তোমাদেরকে কি এই পৃথিবীতে এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে?

এই বাগানসমূহে, এই ঝরণাসমূহে, এই কৃষিক্ষেত্রসমূহে, খেজুরবৃক্ষসমূহে যার খোসাগুলো নরম। আর তোমরা পাহাড়গুলো কেটে কারুকার্য মন্ডিত প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করছো। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার কথা গ্রহণ করো, আর এই অবাধ্য লোকগুলোর (সমাজ বা দেশের খোদাহীন নেতাদের) কথা গ্রহণ করো না, যারা গোটা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, এরা বিপর্যয় দূর করে না। তারা (নবীকে) বললো, তোমার ওপর তো কেউ যাদু করেছে। তুমিও তো আমাদের মতই একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং তুমি যে নবী তার প্রমাণ পেশ করো। যদি তুমি সত্যবাদী হও। (সূরা শু'আরা-১৪১-১৫৪)

দেখে নাও আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শন

হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর কাছে যখন তাঁর জাতি প্রকাশ্য নিদর্শন দাবী করেছিলো, তখন তিনি কোনো ধরণের নিদর্শন দেখানোর ব্যাপারে সম্ভবত দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ নিদর্শন আসার পরে যদি তাঁর জাতি অস্বীকার করে, আল্লাহর বিধানের প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে তারা গযবের উপযুক্ত হয়ে যাবে এবং অবশ্যই আল্লাহর গযবে এই জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। নিজ জাতির প্রতি এই বেদনাবোধ তাঁকে বলতে বাধ্য করেছিলো–

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ، فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ–

সালেহ বললো, হে আমার জাতির লোকজন! তোমরা কি একটুও ভেবে দেখেছো যে, আমার কাছে যদি আমার রবের পক্ষ হতে এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান থাকে এবং তারপর তিনি তাঁর রহমত দানেও ধন্য করে থাকেন আর এরপর আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা প্রদর্শন করি, তাহলে আল্লাহর গ্রেফতারী হতে আমাকে কে বাঁচাবে? আমাকে অধিক ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করা ব্যতীত কি তোমরা আমার কোন কাজে আসবে? (সূরা হূদ-৬৩)

কিন্তু হতভাগা জাতি তাঁর কথা শুনলো না। তারা প্রকাশ্য নিদর্শন দাবী করলো। তারা নিশ্চয়তার সাথে জানালো প্রকাশ্য নিদর্শন দেখলে তারা আল্লাহর বিধান মেনে নিবে। হযরত সালেহ্ (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহ তা'য়ালা উট দান করলেন। এরপর হযরত সালেহ্ (আঃ) নিজ জাতিকে লক্ষ্য করে বললেন–

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ–

হে আমার জাতির জনগণ! লক্ষ্য করো, আল্লাহর এই উটটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করার জন্য অবাধে ছেড়ে দাও। এর পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করো না। অনথ্যায় তোমাদের ওপরে আল্লাহর আযাব আসতে খুব বেশী দেরী হবে না। (সূরা হূদ-৬৪)

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ، هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَاتَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ–

তোমাদের কাছে তোমাদের রব-এর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে পৌঁছেছে, এটা আল্লাহর উট, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং এই উটকে ছেড়ে দাও, আল্লাহর যমীনে বিচরণ করবে। কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না। যদি করো তাহলে এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাব তোমাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা আ'রাফ-৭৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা যে প্রকাশ্য প্রমাণের কথা বলেছেন, সে প্রমাণ ছিল আল্লাহর উট। সামূদ জাতির লোকজন হযরত সালেহ (আঃ)-এর কাছে তাঁর প্রকৃত নবী হওয়ার অনুকূলে অকাট্য প্রমাণ ও দলীল স্বরূপ নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। তাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ হযরত সালেহ (আঃ)-কে এক বিস্ময়কর উট দান করেছিলেন।

এই উট আগমনের ঘটনা হতেই তো অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় যে, উটের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলোই একটি মুজিযা হিসাবে। নবী রাসূলগণ নবুয়াতের সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে অমান্যকারীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরণের মুজিযা পেশ করে

থাকেন, এটাও তেমনি একটি মুজিযা। এই উটের মুজিযা হবার আরো একটি প্রমাণ যে, হযরত সালেহ (আঃ) এই উটকে উপস্থিত করে তাঁর বিভ্রান্ত জাতিকে সতর্ক করে বলেছিলেন, এখন এই উটের জীবনের সাথে তোমাদের জীবন জড়িত হয়ে গেছে। এই উট স্বাধীনভাবে তোমাদের যমীনে চলাফেরা করবে।

এই উটকে তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিল। তাদের পানি পান করার কূপে একদিন সেই উট পানি পান করবে, এটাও তারা নীরবে সহ্য করলো। শেষ পর্যন্ত তারা সকলে পরামর্শ করে সেই উটকে হত্যা করলো। হযরত সালেহ (আঃ)-এর হাতে বাহ্যিক কোনো ক্ষমতা ছিল না, এ কারণে তারা যা খুশী তাই করতে পারলো। প্রথমে তারা এই উটকে রীতিমত ভয় করেই চলতো। কারণ এই উট আরেকটি উট থেকে জন্ম নেয়নি। মহান আল্লাহ সম্পূর্ণ মুজিযা হিসাবেই এই উটকে দান করেছেন। এই উটের পেছনে যে একটি বিরাট শক্তি কাজ করতো তারা এটা বিশ্বাস করতো। কিন্তু পরবর্তীতে তারা সীমালংঘন করে আল্লাহর এই উটকে হত্যা করেছিল।

মুজিযা হিসেবে মহান আল্লাহ যে উট দান করেছিলেন, সেই উটকে তারা হত্যা করলো অর্থাৎ এই উটকে হত্যার মধ্য দিয়েই তারা প্রমাণ করে দিল যে, তারা সত্য গ্রহণ করবে না এবং তারা গযবের উপযুক্ত। এই উটকে যদিও একজন লোক হত্যা করেছিল, কিন্তু গোটা জাতি সে অপরাধী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং হত্যাকারী ব্যক্তি সেই অপরাধ প্রবণ জাতির ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল বলে গোটা জাতিকেই অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি জাতির রাজনৈতিক জীবনের দিকে ইশারা করা হয়েছে। জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যখন অপরাধে লিপ্ত হয় বা অপরাধ প্রবণ মানুষকে নেতা নির্বাচিত করে, এই নেতার কার্যক্রমের পেছনে গোটা জাতির বা যারা তাকে নির্বাচিত করে তাদের সমর্থন থাকে। কারণ এই ব্যক্তি তো তাদের সমর্থনেই ক্ষমতায় আরোহণ করেছে। তখন সেই নেতার অপরাধ জাতীয় অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হবে। পবিত্র কোরআন ঘোষনা করছে, যে অপরাধের কাজ জাতির সামনে প্রকাশ্যভাবে করা হবে এবং জাতি তা নীরবে মেনে নেবে বা সমর্থন করবে– কোনো প্রতিবাদ করবে না, এটাও জাতীয় অপরাধ। আর এই অপরাধের কারণে আল্লাহ ঐ নেতাকেই শুধু শাস্তি দিবেন না– সমগ্র জাতিকেই শাস্তি দিবেন।

আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শন–উট

তাদের দাবী অনুসারে হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ এমন এক পদ্ধতিতে একটি উট প্রেরণ করেছিলেন, যা করা কোন মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর জাতিকে বললেন, তোমাদের দাবীকৃত নিদর্শন তোমাদের সামনে উপস্থিত। যদি তোমরা এই উটকে কোনো ধরণের কষ্ট দাও তাহলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমরা যে কূপ হতে পানি পান করো, আল্লাহ নিয়ম করে দিয়েছেন যে, ঐ কূপের পানি একদিন তোমরা এবং একদিন উট পান করবে। পবিত্র কোরআন অতীতের সেই ইতিহাস বর্ণনা করছে–

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ، وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ، فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ، فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً، وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ، وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ–

সালেহ বললেন, এটা একটি উট এবং এর জন্য পানি পান করার পালা একদিম আর তোমাদের জন্য একদিন নির্দিষ্ট। আর এই উটকে অন্যায়ভাবে বিরক্ত করো না। যদি করো তাহলে বড় কঠিন দিনের আযাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করবে। তারপর তারা সেই উটের পা কেটে উটকে হত্যা করলো। এরপর তারা অনুতাপ করলো। তারপর আযাব এসে তাদেরকে গ্রেফতার করলো। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না। আর নিঃসন্দেহে তোমার রব মহাশক্তিমান এবং পরম দয়ালু। (সূরা শু'আরা-১৫৫-১৫৯)

পবিত্র কোরআন এই উটকে 'নাকাতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর উট নামে ভূষিত করেছে। এই উটটি কি ধরণের ছিল, কিভাবে এই উট অস্তিত্ব লাভ করেছিল, কোরআন ও সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং এই উট সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ যে বর্ণনা পেশ করেছেন, তা গ্রহণ করা একান্তই নিজস্ব বিষয়। তবে এই উট যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অকাট্য মুজিযা এবং প্রমাণ ছিল, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষনাও করেছে।

ইবনে কাসীর এই উটের অস্তিত্ব কিভাবে লাভ করেছে, এ সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে উল্লেখ করেছেন। হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতি তাঁর কাছে অঙ্গীকার করেছিল, তুমি যদি কোনো নিদর্শন দেখাতে পারো তাহলে আমরা তোমাকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করবো। আল্লাহর নবী তাদেরকে বলেছিলেন, এমন যদি হয় যে নিদর্শন দেখানোর পরেও তোমরা সত্য পথ অবলম্বন না করো তাহলে তোমাদের ওপর আল্লাহ নারাজ হবেন এবং তোমরা ধ্বংসের উপযোগী হয়ে যাবে।

তারা দৃঢ়তার সাথে বলেছিল, আমরা নিদর্শন দেখার পরে তোমাকে অস্বীকার করবো না। দুর্বল কোনো বর্ণনা বা তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর জাতির কাছে জানতে চাইলেন, তোমরা কি ধরনের নিদর্শন দেখতে চাও? তারা দাবী করেছিল, সামনের ঐ পাহাড় থেকে বা এই এলাকার কোনো একটি পাথর থেকে এমন একটি উট বের করো যা এই মুহূর্তে গর্ভধারণ করে এখনই বাচ্চা প্রসব করবে।

হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর জাতির দাবী অনুযায়ী মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। সাথে সাথে সামনের পাহাড় থেকে একটি উট আত্মপ্রকাশ করলো। উটটি মুহূর্তে গর্ভধারণ করে বাচ্চা প্রসব করেছিল। এই ঘটনা দেখে সামূদ জাতির এক নেতা– তাওরাতে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে জেন্দো ইবনে আমর হিসাবে, সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ইসলাম কবুল করবে এই সময় তাদের মন্দিরের পুরোহিত যাত্তায়ার ইবনে আমের ও খাবার, আর তাদের জাতীয় গণক রোবাব ইবনে ছেফর প্রবল বিরোধিতা করেছিল। ফলে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ না করে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল।

হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর জাতিকে সতর্ক করে দিলেন যে, তোমাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ এই উটকে নিদর্শন হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনিই এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কূপের পানি একদিন তোমাদের ও তোমাদের সকল পশুদের জন্যে। আরেকদিন শুধু এই উটের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। এই উটকে কোনো ধরণের কষ্ট দেয়া যাবে না। যদি কষ্ট দাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

সামূদ জাতি যদিও হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেনি, তবুও তারা এই উট দেখে ভয় পেয়েছিল। এ কারণে তারা উটকে কষ্ট দিতো না। আল্লাহর নবী পানি

পান করার যে নিয়ম চালু করেছিলেন, সেই নিয়ম তারা পালন করছিল। উটের দুধও তারা পান করতো। উট স্বাধীনভাবে তার বাচ্চাসহ চারণ ভূমিতে চরতো।

সামূদ জাতির পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দ এটাও সহ্য করতে পারেনি। তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকলো কিভাবে এই উটকে হত্যা করা যায়। ঘটনা দৃষ্টে অনুমান করা যায়, জাতীয় নেতৃবৃন্দ গোপনে হযরত সালেহ (আঃ) এবং তাঁর দোয়ার বরকতে প্রকাশিত উট ও তার বাচ্চার বিরুদ্ধে জনসমর্থন যোগাড় করেছিল। এই উটকে হত্যা করার জন্য তারা কয়েক জন সুন্দরী নারীকে কাজে লাগিয়েছিল, যারা ছিল সে সমাজে চরিত্রহীনা বা দেহপসারীণি।

সে নারীগণ কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী লোকের কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিল, তোমরা যদি এই উটকে এবং হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যা করতে পারো, তাহলে তোমরা আমাদেরকে ভোগ করতে পারবে। তারা নারীদের কথায় রাজী হয়ে উটকে হত্যা করলো। উটের বাচ্চাটি তার মা'কে হত্যা করতে দেখে চিৎকার করতে করতে পাহাড়ের দিকে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুধু উটকে হত্যা করেই তারা বিরত হলো না, সামূদ জাতির নয়জন নেতা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলো, ভোর রাতে হযরত সালেহ (আঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং ঈমানদার লোকদের হত্যা করবে। আর এ ব্যাপারে তারা শপথ করলো যে, হত্যার ব্যাপারে কেউ-ই কারো নাম প্রকাশ করবে না এবং তদন্ত করা হলে তদন্তকারী দলকে তারা জানাবে, আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। এদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ، قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّه وَاَهْلَه ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّه مَاشَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِه وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ– .

সেই শহরে ছিলো নেতা গোছের নয়জন লোক, যারা আমার যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াতো। সংশোধনমূলক কোনো কাজই তারা করতো না। একদিন তারা একজন আরেকজনকে বললো, চলো আমরা আল্লাহর নামে সকলে শপথ করি, আমরা রাতের বেলায় তাকে ও তার ঈমানদার সাথীদেরকে হত্যা করবো। এরপর

তদন্ত এলে আমরা তার উত্তরাধিকারীকে বলবো, তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার সময় আমরা তো সেখানে ছিলামই না, আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি। (সূরা নামল-৪৮-৪৯)

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী হযরত সালেহ (আঃ)-কে উক্ত নয়জন নেতার চক্রান্ত থেকে হেফাজত করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ –

তারা যখন সালেহকে হত্যা করার জন্যে এই চক্রান্ত করছিলো, তখন আমিও তাকে রক্ষা করার জন্যে এমন এক কৌশল বের করলাম, যা তারা বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারেনি। (সূরা নামল-৫০)

অবশেষে হযরত সালেহ্ (আঃ) তাঁর জাতিকে বললেন, আমি যা আশঙ্কা করছিলাম অবশেষে তোমরা তাই ঘটিয়েছো। এবার তোমরা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছো। আল্লাহর এই আযাব আসবে মাত্র তিনদিন পরে। তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো। এই আযাব তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিবে।

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ، ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ–

এরপর তারা সে উটকে হত্যা করলো, তখন সে (সালেহ্) বললো, চলে যাও, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও, আযাবের ব্যাপারে আল্লাহর এই ওয়াদা কখনো মিথ্যা হবার নয়। (সূরা হূদ-৬৫)

কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরের দিন সকাল হতেই আল্লাহর আযাবের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল। অবাধ্য জনগণের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মাত্র তিনদিন পরই মহান আল্লাহ্ এমন ভয়ঙ্কর আযাব প্রেরণ করেছিলেন যে, তারা ক্ষণিকের মধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

মহান আল্লাহ যে জীবন বিধান দান করেছেন, সে বিধান ব্যতীত কখনো শান্তি আসতে পারে না। কিন্তু মানব রচিত মতবাদ মতাদর্শের ধারক-বাহকরা দাবী করে যে, আমরা দেশবাসীর কল্যাণের জন্য, তাদের মুক্তির জন্যই এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছি। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বহুস্থানে বলেছেন এই লোকগুলোই হলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

আর প্রত্যেক যুগেই এই ধরণের পথভ্রষ্ট নেতা খুব একটা বেশী সৃষ্টি হয়নি। এদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু এই নেতারা তাদের অর্থ এবং ক্ষমতা দিয়ে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, দেশের অধিকাংশ মানুষ বাধ্য হয়েছে এদের অনুসরণ করতে। হযরত সালেহ (আঃ)–এর সময় এই ধরনের বিভ্রান্ত নেতা ছিল মাত্র নয়জন। এরাই দেশের মানুষকে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করা হতে বিরত রাখতো।

কোরআনে আঁকা সামূদ জাতির ধ্বংস চিত্র

অবশেষে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিদ্রোহী সামূদ জাতির জন্যে সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর করলেন, যা ইতোপূর্বে আ'দ জাতির প্রতি কার্যকর করেছিলেন। পবিত্র কোরআনে সামূদ জাতির প্রতি আল্লাহর আযাবের ধরণ সম্পর্কে কোথাও বলা হয়েছে, বজ্র-ধ্বনিওয়ালা বিদ্যুৎ, কোথাও বলা হয়েছে ভূ-কম্পন সৃষ্টিকারী বস্তু, কোথাও বলা হয়েছে, ভয়ংকর ধ্বনি, কোথাও বলা হয়েছে বিকট চিৎকার। এই কথাগুলো বলা হয়েছে এ কারণে যে, মূল বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বিশেষণের পরিপ্রেক্ষিতে। মানুষ যেন সহজেই বুঝতে পারে, আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতা কেমন ছিল।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তোমরা বারবার কল্পনা করে দেখো, এমন একটি বিদ্যুৎ যা চমকিত হচ্ছে এবং তোমাদের চোখ ঝাপসা করে দিচ্ছে। বিদ্যুতের ভয়ঙ্কর ধ্বনিতে তোমাদের কান কোনো শব্দ অনুভব করার শক্তি হারিয়ে ফেলছে। পায়ের নীচের মাটি থরথর করে কাঁপছে। দৃষ্টির সামনে আলোকিত পরিবেশটা হঠাৎ করেই অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে। এসব দৃশ্য তোমরা তোমাদের সামনে অহরহ দেখছো। আর সামূদ জাতির ওপরে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। তাদের ওপরে যে ধ্বংস নেমে এসেছিল, তা ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

নিয়ে এসো সেই আযাব

আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই ঐ গোনাহ্ ক্ষমা করেন না, যারা দম্ভভরে গোনাহ্ করে এবং গোনাহ্ করার পর অহঙ্কারের সাথে বলতে থাকে, 'যা করেছি তা ঠিকই করেছি, আবারো করবো।' এ ধরণের বিদ্রোহী লোকদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বরদাস্ত করেন না। তাঁর অমোঘ নিয়মে আযাবের কঠিন চাবুক সেই বিদ্রোহী বান্দার প্রতি নেমে আসে। সামূদ জাতিও আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শন উটকে হত্যা করে দম্ভভরে দাবী করেছিলো–

فَعَقَرُوْا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّـهِمْ وَقَالُوْا يصلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ، فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لاَّتُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ–

তারপর তারা সেই উটকে হত্যা করলো এবং পূর্ণ অহঙ্কারের সাথে তাদের রব-এর স্পষ্ট নির্দেশের বিরোধিতা করলো। আর সালেহকে বলে দিল, নিয়ে এসো সেই আযাব, যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো, যদি তুমি সত্যই একজন রাসূল হয়ে থাকো। শেষ পর্যন্ত একটি প্রলয়ঙ্করী বিপদ এসে তাদেরকে গ্রাস করলো এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে উল্টিয়ে পড়ে থাকলো। আর সালেহ সেই কথা বলে তাঁর জনপদ হতে বের হয়ে গেল, হে আমার জাতি! আমি আমার রব-এর নির্দেশ তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের অনেক কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু আমি কি করবো, তোমাদের কল্যাণকামীকেই তোমরা পসন্দ করো না। (সূরা আ'রাফ-৭৭-৭৯)

তাদেরকে আমি হেফাজত করলাম

একাধিকবার অবকাশ ও সুযোগ দেয়ার পরও যখন কেনো অবাধ্য-বিদ্রোহী জাতি আল্লাহর নাযিল করা জীবন ব্যবস্থার দিকে ফিরে আসে না, তখন সেই জাতির নবী-রাসূলকে আযাবের বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হতো। নির্দেশ দেয়া হতো তোমার অনুসারীদের সাথে নিয়ে এই স্থান থেকে সরে যাও। হযরত সালেহ (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতিও আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছিলেন, সামূদ জাতির বসবাসের এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবার জন্যে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَه بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ، وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ، كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا، اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَاْ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ، اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ–

শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়সালার সময় উপস্থিত হলো, তখন আমার রহমত দিয়ে সালেহকে ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা হতে তাদেরকে বাঁচালাম। নিঃসন্দেহে তোমাদের রবই আসলে শক্তিমান এবং প্রবল। আর যারা জুলুম করেছিল, এক প্রচন্ড শব্দ তাদেরকে আঘাত হানলো এবং তারা নিজেদের ঘরে এমনভাবে নিস্পন্দ ও নির্জীব হয়ে পড়ে থাকলো যেন তারা সেখানে কোনদিনই বসবাস করেনি। শোন! সামুদ তাদের রবের সাথে কুফুরী করেছে। আরো শোন! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে সামূদকে। (সূরা হূদ-৬৬-৬৮)

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ، وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ–

তারপর সামুদ, তাদের সামনেও আমি অভ্রান্ত হিদায়েতের পথ প্রদর্শন করলাম। কিন্তু তারা পথ দেখার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে থাকাই পছন্দ করলো। শেষ পর্যন্ত তাদের

কর্মকান্ডের বিনিময়ে অপমানের আযাব তাদের ওপর ভেঙ্গে পড়লো। এবং আমি সেই লোকদেরকে হেফাজত করলাম, যারা ঈমান এনেছিল এবং গোমরাহী ও দুষ্কৃতি হতে বিরত ছিল। (সূরা হামিম সিজদা-১৭-১৮)

ভয়ঙ্কর বিকট ধ্বনি

হযরত সালেহ (আঃ)-এর আহবানে যারা সাড়া দেয়নি এবং তাঁর সাথে যারা বিরোধিতা করেছে, তাদের ধ্বংসের চিত্র পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েক স্থানে মহান আল্লাহ তুলে ধরেছেন।

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ، وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ، فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ، فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

হিজ্‌রের অধিবাসীগণও নবীদের অস্বীকার করেছিল, আমি আমার নিদর্শনসমূহ তাদেরকে দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সত্য গ্রহণ হতে বিরত থাকলো। তারা পাহাড় কেটে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতো যেন তারা সুরক্ষিত থাকে। (তাদের দেহের শক্তি আর সুরক্ষিত বাড়ি-ঘর তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি) একদিন ভোরে এক ভয়ঙ্কর ও বিকট ধ্বনি এসে তাদেরকে গ্রেফতার করেছিল। (তারা নিজের বাড়িতেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল) আর তারা নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা কিছুই উপার্জন করেছিল তা তাদের কোনোই কাজে এলো না। (সূরা হিজ্‌র-৮০-৮৪)

এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আল হিজ্‌র এলাকার বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে মাদায়েনে সালেহ্। এই হিজ্‌র এলাকা নবী-রাসূলদের ইতিহাসে অসংখ্য ঘটনাবহুল এলাকা। এ কারণে পবিত্র কোরআনের একটি সূরার নামকরণই করা হয়েছে সূরা হিজ্‌র।

পাপীদের ভোগের সীমা অন্তহীন নয়

আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহী অবাধ্য সামূদ জাতি ভেবেছিল, পাহাড় কেটে আমরা যে বিশাল আকারের অট্টালিকা নির্মাণ করেছি, স্বাভাবিক মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনো ধরণের বিপর্যয় আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন-

وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ، فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ، فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ-

(নিদর্শন রয়েছে) সামুদ জাতির (কাহিনীর) মধ্যেও, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুখ ভোগ করতে থাকো। (কিন্তু) তারা তাদের মালিকের কথার নাফরমানী করলো। অতপর এক প্রচন্ড বজ্রাঘাত তাদের ওপর এসে পড়লো এবং তারা চেয়েই থাকলো। (আযাবের সামনে) তারা (একটুও) দাঁড়ানোর শক্তিও পেলো না এবং এ আযাব থেকে নিজেদের তারা বাঁচাতেও পারলো না। (সূরা যারিয়াহ-৪৩-৪৫)

وَاَنَّه اَهْلَكَ عَادَ نِ الاُوْلٰى، وَثَمُوْدَا فَمَا اَبْقٰى-

আর এই যে, তিনি প্রথমে আ'দ জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন এবং সামুদকেও, তারপর তাদের কাউকে অবশিষ্ট রাখলেন না। (সূরা নাজম-৫০-৫১)

চূর্ণ-বিচূর্ণ বৃক্ষ শাখার মতই ভুষি হয়ে গেল

ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শনকারী সামুদ জাতির ধ্বংস চিত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ، فَقَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُه، اِنَّا اِذًا لَّفِيْ ضَلَلٍ وَّسُعُرٍ، ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ، سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الاَشِرُ، اِنَّا مُرْسِلُوْا النَّاقَة فِتْنَةً لَّهُمْ

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ، فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطى فَعَقَرَ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ،اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ–

সামূদ জাতি সাবধান বাণী ও সতর্ক সঙ্কেত মিথ্যা মনে করেছিল। এবং বলেছিল, একজন একা মানুষ যে আমাদেরই একজন, আমরা কি এখন তাঁর পেছনে চলতে শুরু করবো? তাঁর অনুসরণ করতে শুরু করলে তার অর্থ হবে এই যে, আমরাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি এবং আমাদের বিবেক বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে কি শুধু এই এক ব্যক্তিই এমন ছিল যে, যার প্রতি আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হয়েছে? না, বরং এই ব্যক্তিই বড় মিথ্যাবাদী ও স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত।

(আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বললেন) অতিদ্রুত তারা জানতে পারবে, কে বড় মিথ্যাবাদী ও বিভ্রান্ত। আমি উটকে তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ প্রেরণ করেছি, এখন কিছুটা ধৈর্য সহকারে দেখো ও লক্ষ্য করো যে, এই লোকদের পরিণামটা কি হয়। এই লোকদের সতর্ক করে দাও যে, পানি তাদের ও উটের মধ্যে ভাগ হবে এবং প্রত্যেকেই নিজের জন্য নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে পানি পান করতে আসবে। শেষ পর্যন্ত এই লোকরা নিজেদের লোককে ডাকলো সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে উটকে হত্যা করলো। তারপর দেখো, আমার আযাব কত ভয়ঙ্কর ছিল এবং আমার সাবধানবাণী ছিল কত ভয়াবহ। আমি তাদের ওপর শুধুমাত্র একটি শব্দ ছেড়েছি, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীদের নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল পালার মতই ভুষি হয়ে গেল। (সূরা কামার-২৩-৩১)

ওপরে উঠিয়ে যমীনে আছাড় দেয়া হয়েছে

কোরআনের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, এই জাতিকে অনেক ওপরে উঠিয়ে নিয়ে যমীনের ওপরে আছাড় দিয়ে ফেলা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন–

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌم بِالْقَارِعَةِ، فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ–

সামুদ ও আ'দ সেই আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য মহাবিপদকে অবিশ্বাস করেছে। তারপর যারা সামুদ জাতি ছিল, তাদেরকে আমি উর্ধ্বে উঠিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি। (সূরা হাক্কাহ্-৪-৫)

আমাদের দেশেও মাঝে মধ্যে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়। পত্র-পত্রিকায় এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়, প্রবল ঝড়ের আঘাতে লৌহ নির্মিত টিউবওয়েল মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাল গাছের মাথায় ঝুলছে। হাজার হাজার টন ওজনের পানি জাহাজ ঝড়ের তান্ডবে সমুদ্র থেকে উড়ে এসে জনপদে আছড়ে পড়েছে। নিকট অতীতেও দেখা গেলো সুনামীর লোমহর্ষক ধ্বংস লীলা। আ'দ ও সামূদ জাতিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'য়ালা এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যে, উক্ত বিদ্রোহী জাতি পত্র-পল্লবের মতোই মহাশূন্যে উড়ে যমীনে আছড়ে পড়েছিলো।

এভাবে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আ'দ ও সামুদ জাতির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। শুধু তারাই নয়, অতীতে যেসব জাতি আল্লাহর বিধানের সাথে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে, তারপর তারা কিভাবে আল্লাহর গযবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেসব ইতিহাস আল্লাহ মানুষকে শুনিয়েছেন। মানুষ যেন এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মহাধ্বংস থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করে।

অভিশপ্ত এলাকায় গুপ্তধন

আল হিজ্‌র তথা মাদায়েনে সালেহ্ এলাকা বিশাল বিস্তীর্ণ। সমগ্র এলাকা ঘুরে দেখতে যে সময়ের প্রয়োজন, সে সময় আমার ছিলো না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ২৪শে মার্চ ২০০৭ অর্থাৎ আজকেই আমাকে মদীনায় ফিরে যেতে হবে এবং আগামী কালই যেতে হবে সউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে। সময় স্বল্পতার কারণে পাহাড় কেটে নির্মিত প্রত্যেকটি কোঠাবাড়ি ঘুরে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে দূর থেকে যতটুকু দেখা যায় ততটুকু দেখেছি।

আমি লক্ষ্য করলাম, এই এলাকায় যেমন অগণিত পর্বত শ্রেণী রয়েছে তেমনি রয়েছে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। কোথাও কোথাও মরুভূমিও রয়েছে। পাহাড় পরিবেষ্টিত সমতল ভূমিসমূহে বিশেষ বিশেষ মৌসুমে প্রচুর গুল্ম-লতা জন্মে– যা উট, ছাগল ও দুম্বার খোরাক যোগায়।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, সমতল ভূমির কোথাও কোথাও লৌহ নির্মিত নেট পরিবেষ্টিত কিছু এলাকা। অথচ নেট পরিবেষ্টিত এলাকায় তেমন কোনো দর্শনীয় বস্তু আমার চোখে পড়লো না। মনে প্রশ্ন জাগলো, লৌহ নির্মিত নেট দিয়ে ঘেরাও করে রাখা স্থানগুলোয় এমন কি রয়েছে যে, এভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনী দেয়া হয়েছে?

আমাদের গাইড ইঞ্জিয়ার বেলাল সাহেব বললেন, বেষ্টিত এলাকায় পাথুরে কঙ্করময় ভূমির নীচে রয়েছে আ'দ, সামূদ এবং তৎপরবর্তী যুগের মানুষের সঞ্চিত মূল্যবান সম্পদ। আমরা কোরআন-হাদীস এবং ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছি, উক্ত জাতিসমূহ উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌছেছিলো। তারা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলো। অর্থ-বিত্ত, বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং দৈহিক শক্তিই আ'দ ও সামূদ জাতিকে অহঙ্কারে মদমত্ত করেছিলো।

কিন্তু তাদের বিপুল ধন-সম্পদ ও দৈহিক শক্তি তাদেরকে সেই আযাব থেকে হেফাজত করতে পারেনি, যে আযাব তাদেরই অপরাধের কারণে এসেছিলো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

আর তারা নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা কিছুই উপার্জন করেছিল, আল্লাহর গযবের সামনে তা তাদের কোনোই কাজে এলো না। (সূরা হিজ্‌র-৮৪)

খাদিমুল হারামাইনিশ্ শারিফাইন– উভয় হারাম শরীফের খাদেম সাউদী সরকার ও জনগণকে আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত রহমত করে যে সকল নিয়ামত দান করেছেন, তা ব্যবহার করেই সাউদী আরবকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। অতীতকালের জনগোষ্ঠীর ধন-রত্ন কোথায় মাটির নীচে কি অবস্থায় রয়েছে তা খুঁজে বের করে দেশের উন্নতির কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা এখন পর্যন্ত সাউদী সরকার অনুভব করেননি।

.হ্ (আঃ)-এর কূপ

মাদায়েনে সালেহ্ এলাকায় বিশেষ একটি কূপ আমার চোখে পড়লো, কূপটি হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর যুগের কূপ হিসেবেই পরিচিত। কূপটি বর্তমানে বাঁধানো এবং এর ভেতরের দিকেও লৌহ নির্মিত নেটের আকৃতি বানিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে, যেনো ওপর থেকে কিছু পড়লে তা কূপের তলদেশে না পৌছায়। পাহাড় পরিবেষ্টিত সমতল ভূমিতে এই কূপটি অবস্থিত। এর একদিকে রয়েছে খেজুরের বিশাল বাগান।

জনগণের মধ্যে এ কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে যে, এই কূপেই হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর উট পানি পান করতো। এলাকার লোকজন এবং তাদের পশুদলও সে কূপ থেকে পানি পান করতো। এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা পানি পানের ব্যবস্থা এভাবে করেছিলেন যে, একদিন এলাকার লোকজন ও তাদের পশুদল সে কূপ

থেকে পানি গ্রহণ করবে, পরের দিন হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর উট পানি পান করবে। পবিত্র কোরআনে এ বিষয় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন–

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ–

এই লোকদের জানিয়ে সতর্ক করে দাও যে, পানি তাদের ও উটের মধ্যে ভাগ হবে এবং প্রত্যেকেই নিজের জন্য নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে পানি পান করতে আসবে। (সূরা ক্বামার-২৮)

আল হিজর্ তথা মাদায়েনে সালেহ এলাকায় আ'দ ও সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে আমার স্মরণে এলো, নবী করীম (সাঃ) তাবুক অভিযানকালে এই পথ দিয়েই তাবুকে গিয়েছিলেন। এখান থেকে প্রায় দুইশত কিলোমিটার দূরেই তাবুক। আর মদীনা থেকে তাবুকের দূরত্ব হলো ৭০৭ কিলোমিটার। মাদায়েনে সালেহ্ এলাকায় পৌঁছে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উক্ত কূপটি দেখিয়ে বললেন, এটাই হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর কূপ। এই কূপ ব্যতীত তোমরা অন্য কোনো কূপ থেকে পানি পান করবে না। তারপর একটি পাহাড়ী পথ দেখিয়ে বললেন, এই পথ দিয়েই হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর উট পানি পান করতে আসতো। বর্তমান সময় পর্যন্তও ঐ রাস্তাটি 'ফাজ্জুন নাকাহ্' নামে পরিচিত।

সাউদী আরবে গ্রীষ্মকাল যে কেমন হয়ে থাকে, যারা এখানে এসেছেন এবং বসবাস করেন তারা ব্যতীত আর কারো পক্ষে তা অনুভব করা সম্ভব নয়। প্রচন্ড তাপ-প্রবাহে পাথুরে পাহাড়, কঙ্করময় ভূমি এবং বালুকাময় মরুপ্রান্তর থেকে যেনো অনল প্রবাহিত হতে থাকে।

নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মাথার ওপর প্রখর সূর্য কিরণ আর পায়ের নীচে তপ্ত পাথুরে পথ পায়ে হেঁটে গ্রীষ্মের মৌসুমে মদীনা থেকে দীর্ঘ ৭০৭ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে তাবুকে গিয়েছিলেন। বর্তমান যুগের মতো সে যুগে পথে পানি পানের ও ছায়ার ব্যবস্থা ছিলো না। আল্লাহর নাযিল করা বিধান প্রতিষ্ঠা এবং টিকিয়ে রাখার জন্যে নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনাতীত কষ্টের সাগর অতিক্রম করেছেন। তাঁদের সীমাহীন কষ্টের বিনিময়েই পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

পরবর্তীতে আরব দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা আল্লাহ তা'য়ালা ভ্রমণের সুযোগ করে দিলে তখন তাবুক যুদ্ধের ইতিহাস এবং জর্ডানসহ যেসব এলাকায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতিসমূহের নিদর্শন রয়েছে, তা গ্রন্থাকারে পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাবো ইনশাআল্লাহ।

স্মৃতিতে ভাস্বর মাদায়েনে সালেহ্

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আজই আমাকে মদীনায় ফিরে যেতে হবে এবং মদীনা থেকে আগামী কাল ২৫শে মার্চ ২০০৭ তারিখে সাউদী আরবের রাজধানী শহর রিয়াদ পৌছতে হবে। আলউলা প্রদেশ এবং মাদায়েনে সালেহ্ এলাকা যেভাবে দেখা প্রয়োজন ছিলো, সময় স্বল্পতার কারণে সেভাবে দেখা হলো না। মনের গহীনে এক অতৃপ্ত ভাব রয়ে গেলো। পবিত্র ভূমি মদীনা যাবার জন্যে গাড়িতে উঠে বসলাম। এখানে আসার সময় যে পথে গাড়ি এসেছিলো, এখন ভিন্ন পথ ধরে মদীনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি পিছন ফিরে বারবার সেই এলাকা দেখছি, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলামের সাথে বিদ্রোহ করার কারণে যে এলাকার অধিবাসিদের ওপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়েছিলো।

এক সময় দৃষ্টি থেকে মাদায়েনে সালেহ্ আড়াল হয়ে গেলো। আলউলা প্রদেশ থেকে যারা আমার সফরসঙ্গী হয়েছিলো, তাঁরাও আমার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। মদীনার দিকে গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটে চললেও আল্লাহর গযব নিপতিত এলাকার ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্যসমূহ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। সারাটি পথই আমার চোখের সম্মুখে সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষের নানা চিত্র ভেসে উঠছিলো।

ভাবছিলাম স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে– যিনি হযরত নূহ্ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, আ'দ, সামূদ, হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়, কারূণ, ফিরআউন, নমরুদ, সাদ্দাদ, বাবেল নগরী, ইটালীর পম্পেই নগরীসহ আরো অজানা অগণিত নরপতি ও নগরীর অধিবাসীর ওপরে এমন গযব নাযিল করেছিলেন যে, তাদের নাম-নিশানা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গিয়েছে। বর্তমানে নৃতত্ত, ভূতত্ত ও প্রত্নতত্তবিদগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে দূর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার হচ্ছে।

আমি কল্পনাও করতে পারিনা, চরম দুর্বল এবং অসহায় এই মানুষ কিভাবে মহাশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ করে! বাঘ, সিংহ, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী যখন শাবক প্রসব করে তখন শাবকগুলোর চোখ ফোটে না। এসব

শাবক ক্ষুধায় মারা গেলেও কখনো এরা মায়ের দুধ ব্যতীত অন্য কিছুতে মুখ দিবে না। কিন্তু মানুষ যখন বাকশক্তিহীন শিশু থাকে তখন নিজের মলমূত্র নিজেই খায়। আগুনে জ্বলে গেলে বা পানিতে ভিজলেও এরা অন্যের সাহায্য ব্যতীত নিরাপদ স্থানে যেতে পারে না। ক্ষুধার কথা বলতেও পারে না। মানুষ এতই দুর্বল আর অসহায়। অথচ এই মানুষ এমন কাজ করে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে গযব নাযিল করে সকলকে ধ্বংস করে দেন।

পবিত্র কোরআন বলছে, সমগ্র সৃষ্টিসমূহ মহান আল্লাহর রহমত কর্তৃক পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেকে অসীম করুণাময়, দয়াবান, মেহেরবান, উদার, ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল বলে কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন এবং সৃষ্টির প্রত্যেক পরতে পরতে নিজের অনুপম গুণাবলীর স্বাক্ষর রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার আরেক নাম 'হালীম' অর্থাৎ তিনি সবথেকে ধৈর্যশীল। আমরা এত গোনাহ্ করছি, তবুও তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করছেন না। কিন্তু বিদ্রোহী জাতিসমূহ কতটা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিলো যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আর ধৈর্য ধারণ করেননি। তাঁর অনুপম দয়া, করুণা ও রহমতকে ছাপিয়ে তাঁর ক্রোধ প্রবল হয়ে উঠেছিলো। তাঁর পক্ষ থেকে গযব এসে অবাধ্য লোকদেরই শুধু ধ্বংস করেনি, তাদের শিশু-কিশোরও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মুক্তি পায়নি।

সেই সকল লোকগুলোও রক্ষা পায়নি, যারা ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড হতে দেখেও বাধা দেয়নি। নিজেরা শুধু নামাজ-রোজা আদায় করেছে, কিন্তু চোখের সামনে আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম তথা পবিত্র কোরআনের অবমাননা হতে দেখে সামান্য প্রতিবাদও করেনি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

তোমরা আল্লাহদ্রোহিতার সেই বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাকো, যার ভয়াবহ শাস্তি– যারা তোমাদের মধ্যে যালিম শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আরো জেনে রাখো, আল্লাহ্ অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। (সূরা আনফাল-২৫)

সমাজ ও দেশে যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে , ইতিহাস বলে– এসব লোকদের সংখ্যা কোনো যুগেই বেশি ছিলো না। পবিত্র কোরআন জানাচ্ছে, হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর সময় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নেতা গোছের লোকছিলো মাত্র নয়জন। অন্যান্য

নবী-রাসূলগণের যুগেও এ ধরণের দুর্বৃত্তদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতেও আমরা লক্ষ্য করছি, সমাজ, দেশ ও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান মাত্র গুটি কয়েক লোকজন। নিজেদের ক্ষতি হবে, ভোগ-বিলাসে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে অথবা স্বার্থে আঘাত লাগবে, এ কারণে অধিকাংশ লোকজন অনাচার সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না। কিন্তু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ যখন নেমে আসবে, তখন দুর্বৃত্তরাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, যারা নীরবতা পালন করে দুর্বৃত্তদের সাহস বৃদ্ধি করেছে, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে– অতীতে মাদায়েনে সালেহ্ এলাকাসহ অন্যান্য এলাকার লোকদের যেমনটি হয়েছে।

মদীনা থেকে রিয়াদের পথে

আজ ২৫শে মার্চ। মদীনায় সাতদিন ও আলউলায় একদিন মিলিয়ে মোট আটদিন অবস্থান করার পর আজই রিয়াদ যাচ্ছি। মসজিদে নববীতে রিয়াজুল জান্নাতে ফজরের নামাজ আদায় করলাম। বুকের মধ্যে মদীনার বিচ্ছেদ বেদনা মুচড়ে উঠছে। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর প্রিয় সাথীদের সালাম জানিয়ে জান্নাতুল বাকিতে ঘুমিয়ে থাকা সাহাবায়ে কেরামের জন্যে দোয়া করে মহান আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি একান্ত অনুগ্রহ করে তোমার রাসূলের দেশে আমাকে এনেছিলে। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমার পক্ষ থেকে তোমার রাসূলের এই পবিত্র স্থানে যদি কোনো বেয়াদবি হয়ে থাকে, তাহলে তুমি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিও। জীবনে বার বার এখানে এসে দরবারে নববীতে সালাম জানানোর সুযোগ করে দিও।'

হোটেলে এসে দেখি **হাফেজ আব্দুস সালাম, রফিকুল ইসলাম, মাওলানা নুরুজ্জামানসহ** অনেকেই আগে থেকেই মদীনা এয়ারপোর্টে আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে হোটেলে প্রস্তুত ছিলো। আমি প্রস্তুতি নিয়ে হোটেলের লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রফিকুলের গাড়িতে উঠে বসলাম। কিছু সময়ের মধ্যেই গাড়ি মদীনা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলো। সাথিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এয়ারপোর্টে প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে প্লেনে উঠে বসলাম।

সাতটা ত্রিশ মিনিটে সাউদী এয়ারলাইন্স রিয়াদের উদ্দেশ্যে আকাশে ডানা মেলে দিলো। একটানা এক ঘন্টা ত্রিশ মিনিট উড়ার পর রিয়াদ এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করলো। রিয়াদ এয়ারপোর্ট বেশ দর্শনীয়। বিশাল এই এয়ারপোর্টের সকল কিছুতেই আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তবে দুবাই এয়ারপোর্টের মতো অতটা দৃষ্টি নন্দন নয়।

রিয়াদ এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়েই দেখলাম জনাব **মাওলানা মুহিব্বুর রহমান**– তিনি সাউদী সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের সেন্সর বোর্ড সদস্য, **জনাব আবুল বাশার**– তিনি দারুল ইসবাত-এর এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার, **জনাব সালেহ সিদ্দিকী, জনাব আব্দুল মুত্তালিব, জনাব শাহজাহান, জনাব খুরশিদ** প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আমাকে নিতে এসেছেন। জনাব সালেহ সিদ্দীকী মাওলানা মুহিব্বুর রহমান, জনাব আবুল বাশার ও জনাব শাহজাহান নিজেদের কাজ-কর্ম রেখে রিয়াদে আমাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মধ্যপ্রাচ্যের সবথেকে বড় শহর হলো রিয়াদ। গাড়িতে উঠে আমার অবস্থান স্থলের দিকে যেতেই আমার চোখে পড়লো, রিয়াদ শহর যেনো নতুন সাজে সজ্জিত। সাজ-সজ্জা দেখেই আমার মনে পড়লো, সাউদী আরবের রাজধানী এই রিয়াদেই আগামী ২৭শে মার্চ আরব লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ কারণে রিয়াদ নগরীকে নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে এবং সমগ্র রিয়াদ নগরী নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করা হয়েছে। এ সময় সাধারণ কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানের অনুমতিও দেয়া হয় না। মহান আল্লাহর অসীম রহমতে সাউদী সরকার এ সময়েই সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমার জন্যে তাফসীর মাহফিলের ব্যবস্থা করেছেন।

মাথা-ই দেহকে পরিচালিত করে

আমাকে যাঁরা নিতে এসেছিলেন তাঁদের মাধ্যমেই জানতে পারলাম আজই ইশার নামাজের পরে একটি রেস্টুরেন্টে আমাকে সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষকে যদি একটি দেহের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে সুধীদের তুলনা করতে হয় সেই দেহের মাথার সাথে। সাধারণ মানুষ হলো দেহ আর সুধীগণ হলেন সেই দেহের মাথা। মাথা মানুষকে যেদিকে পরিচালিত করে দেহ সেদিকেই ধাবিত হয়।

সুধী সমাবেশে আমার বক্তব্যে আমি বললাম, প্রত্যেকটি দেশেই সাধারণত দুই শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে সরকার দেশ পরিচালিত করে। একটি হলো দেশের সাধারণ জনগণ এবং দ্বিতীয়টি হলো দেশের সুধী সমাজ তথা বিশিষ্ট লোকজন। সাধারণ শ্রেণীর লোকজন থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং জনশক্তিও এই শ্রেণীর লোকজনের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদের চিন্তা-গবেষণা ও নেতৃত্ব দেয়ার মতো মস্তিষ্ক এবং যোগ্যতা থাকে না। এরা জ্ঞান-সম্পদেও সমৃদ্ধ হয় না এবং এদের

আর্থিক শক্তিও থাকে না। দেশের বুকে এরা পদমর্যাদাসম্পন্নও হয় না এবং এদের হাতে রাষ্ট্রশক্তিও থাকে না। এ ধরণের নানাবিধ কারণে এরা জাতিকে পারিচালনা করতে পারে না বরং এরাই চালকদের পেছনে চলতে থাকে। এসব লোকজন নিজেরা কোনো পথ বা মত তৈরী করতে পারে না, যে পথ ও মত তৈরী করে দেয়া হয় সে পথে ও মতানুযায়ীই এরা চলতে থাকে।

পথ প্রস্তুত ও মত রচনা করা প্রকৃতপক্ষে সুধী তথা বিশিষ্ট লোকদেরই কাজ। সুধীজনদের প্রত্যেকটি কথা, কাজ, কর্মকৌশল ও কর্মপদ্ধতির পেছনে থাকে উন্নত জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা। তাদের পেছনে থাকে প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ, ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্রের প্রশাসনিক শক্তির সমর্থন-সহযোগিতা। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণ ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, দেশের সুধী সমাজকেই অনুসরণ করে এবং এদেরকেই সমাজ ও দেশের পরিচালিকা শক্তি মনে করে। সমাজ ও দেশের নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত সুধীজনদের মাধ্যমেই পরিবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং এ কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে না যে, সমাজ ও দেশের পরিচালিকা শক্তি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নয়, বরং দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সুধীজনরাই আসল পরিচালক।

সুধীজনদের ওপরই সমাজ ও দেশের উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন ও গঠন এবং ভাঙ্গন নির্ভর করে। এদের সুদৃঢ় মনোবল, উন্নত নৈতিক চরিত্র, অনুপম গুণ-বৈশিষ্ট্য, নমনীয়তা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্যতা, সত্যতা, বলিষ্ঠতা, ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহভীরুতা সমগ্র জাতির ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে এবং সুধীজনরাই দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। আবার সুধীজনদের পথভ্রষ্টতাই সমগ্র জাতির পথভ্রষ্টতার কারণে পরিণত হয়।

যে জাতির সুধীজনরা উন্নত-অনুপম চরিত্র এবং গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, পৃথিবীতে সেই জাতিই চরিত্রবান হিসেবে প্রশংসিত। কোনো জাতির জীবনে যখন কল্যাণময় শুভ দিন আসে, তখন সেই জাতির মধ্যে উন্নত চরিত্র বিশিষ্ট সুধীজনদের আগমন ঘটে। তাঁরা নিজেরা যেমন সততার পথ অবলম্বন করেন তেমনি সমগ্র জাতিকেও সততার পথেই পরিচালিত করেন। পৃথিবীতে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ছিলেন নবী-রাসূলগণ। তাঁদের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ–

আমি তাদের নেতৃত্বের আসনে আসীন করি, তারা আমার আদেশ অনুযায়ী পথ প্রদর্শন করে। তাদের আমি নির্দেশ দান করি শুভকর্ম করার। (সূরা আম্বিয়া-৭৩)

ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীতে যে সকল জাতির নৈতিক বিকৃতি ঘটেছে, ইনসাফ হারিয়েছে, মিথ্যা বলা শিখেছে, অন্যের হক আত্মসাৎ করা শিখেছে, নানা ধরণের দুষ্কৃতিমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছে, এসবের সূচনা হয়েছে সুধী সমাজ থেকে। দেশের বুকে যাবতীয় অপরাধমূলক কর্মের সূচনা সুধী সমাজ ঘটিয়েছে এবং পরবর্তীতে সমগ্র জাতীয় জীবনে তা প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র জাতির মধ্যে অপরাধমূলক কর্মের বিস্তার ঘটেছে। আর এই অবস্থা যখন ঘটেছে, তখনই সেই জাতি ধ্বংসের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا–

আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার বিত্তশালী লোকদের ভালো কাজের আদেশ করি, কিন্তু তারা তা না করে সেখানে পাপাচারের কাজ করতে শুরু করে। এরপর সেখানে আমার আযাবের ফয়সালা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, পরিশেষে আম তা সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে দিই। (সূরা বনী ইসরাঈল-১৬)

আমি নিজ চোখে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সেই আ'দ ও সামূদ জাতির এলাকা পরিদর্শন করেছি। সেই এলাকার লোকদের মধ্যেও আল্লাহ বিরোধিতার সূচনা ঘটেছিলো সুধী সমাজ থেকেই। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন, সামূদ জাতির মধ্যে যে নয়জন বিশিষ্ট লোক ছিলো, তারাই সর্বপ্রথম ইসলামের সাথে বিরোধিতার পতাকা উড়িয়ে ছিলো এবং পরবর্তীতে ক্রমশ সমগ্র জনগোষ্ঠীকে তারা সেই অভিশপ্ত পতাকার নীচে সমবেত হতে বাধ্য করেছিলো। এরপর আরশে আযীম থেকে তাদের জন্যে ধ্বংসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছিলো।

মক্কার সুধীবৃন্দ নবী করীম (সাঃ)-কে সহযোগিতা করেনি বিধায় তিনি মদীনায় হিজরত করেছেন এবং মদীনার সুধীবৃন্দ তাঁর দিকে সকল প্রকার সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন। ফলে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়ে সারা দুনিয়ায় এর সুবাস ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশের অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেশ ও সমাজের অধিকাংশ বিশিষ্টজনদের জীবন পরিক্রমায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) নির্বাসিত। তারা তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনাতেও আল্লাহ-রাসূলের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে চান না। এই সকল ব্যক্তিই প্রবৃত্তি পূজায় লিপ্ত হয়ে নিজেদের জীবন থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দিয়ে সুশীল সেজেছেন।

এরাই নানা ধরণের সংগঠনের নামে আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের গোলাম বানিয়েছে এবং নিজ জাতিকে আল্লাহমুখী করার পরিবর্তে নেতা-নেত্রী ও শাসকদের মুখাপেক্ষী বানাচ্ছে। এ সকল লোকই মহান আল্লাহর পরিবর্তে সাধারণ মানুষকে শক্তিমান মানুষের সম্মুখে মাথানত করতে শিখিয়েছে। এরাই আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করে বিলাস-বহুল অট্টালিকায় বসে পাপাচার ও দুষ্কৃতির গায়ে লোভনীয় রং চড়িয়েছে। এরাই হারাম সম্পদ খেয়ে নিজ জাতিকেও হারামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এরাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাকে পথভ্রষ্টতার জন্যে, জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধিকে অপরাধমূলক কর্মের জন্যে, রাষ্ট্রশক্তিকে অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়নের জন্যে, অর্থ ধন-সম্পদকে মানুষের ঈমান ও বিবেক ক্রয় করার জন্যে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তিমত্তাকে দাম্ভিকতার জন্যে ব্যবহার করছে।

সমাজ ও দেশের অধিকাংশ সুধী, সুজন ও সুশীল হিসেবে দাবীদারগণই সাধারণ লোকদের অধিকার, ইনসাফ, উপকার, কল্যাণ ও নৈতিকতাপূর্ণ পরিচ্ছন্ন জীবন লাভের অধিকাংশ পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এরাই সাধারণ মানুষকে ঘুষ দেয়া, মিথ্যা চক্রান্ত করা, মিথ্যা বলা, তোষামদ ও চাটুকারিতা করা, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করাসহ যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়সমূহ নিজের লক্ষ্য অর্জনের পাথেয় করতে বাধ্য করেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে সুধীজনদেরকে যে নিয়ামতসমূহ দান করেছিলেন, অধিকাংশ সুধীজনরা তা ভুল পথে ব্যবহার করে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং সমাজ ও দেশের সুধীজনরা যদি নিজেরা আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে আল্লাহর দেয়া বিধানের ভিত্তিতে জাতিকে গড়ার জন্যে এগিয়ে আসেন, তাহলে জাতিকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির উচ্চ সোপানে পৌঁছে দেয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। এখনও কিছু সময় অবশিষ্ট রয়েছে, সুধীজনরা যদি নিজেদের ভূমিকা বর্তমানের ন্যায় অপরিবর্তিত রাখেন, তাহলে সেই দিন হয়ত বেশী দূরে নয়, যেদিন সমগ্র জাতির ওপরেই সেই চাবুকের আঘাত হানা হবে, যে চাবুকের আঘাতে সামূদ জাতিকে মুহূর্তে চর্বিত তৃণখন্ডের মতো করে দেয়া হয়েছিলো।

উপস্থিত সুধীদের সম্মুখে আরো কিছু কথা রেখে সেদিনের মতো সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

রিয়াদে খোলা মাঠে বিশাল মাহফিল

ইতোপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি, মধ্যপ্রাচ্যের সবথেকে বড় শহর হলো রিয়াদ। শুধুমাত্র এই রিয়াদ নগরীতেই সাত লক্ষের ওপর বাংলাদেশী নাগরিক কর্মরত রয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের রাজধানীতে এত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। সউদী সরকার ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশীদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, এ জন্যে বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে আমরা সাউদী সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।

রিয়াদ শহরের শিফা এলাকায় বিশাল খোলা মাঠ রয়েছে। সাউদী সরকারের Ministry of Islamic Affairs & Endowment & Call & Guidance আমার এখানে আসা উপলক্ষ্যে ঐ খোলা মাঠে ২৬শে মার্চ এক বিশাল মাহফিলের আয়োজন করছিলো। হাজার হাজার বাংলাদেশী ছাড়াও এই মাহফিলে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ভারতের প্রবাসী নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইতোপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি যে, আগামী কাল ২৭শে মার্চ এই রিয়াদে আরব লীগ সম্মেলন শুরু হচ্ছে। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে সউদী সরকার নিরাপত্তার চাদরে রিয়াদ নগরী আবৃত করেছে। স্কুল, কলেজ- ইউনিভার্সিটিসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অফিসসমূহ তিনদিনের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আরব রাষ্ট্রসমূহের মেহমান এবং বিদেশী সাংবাদিকগণ যেসব এলাকায় অবস্থান করবেন এবং যাবেন, সেসব এলাকার দিকে সাধারণ গাড়ি প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। কোনো ধরণের সমাবেশ করা দূরে থাক– দশজন লোকও এক স্থানে সমবেত হলে নিরাপত্তারক্ষীরা সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে।

এই অবস্থার মধ্যেও সাউদী সরকার আমার মাহফিলের অনুমতিই শুধু দেয়নি সর্বাত্মক সহযোগিতাও করেছে। মাহফিলে আগত লোকদের কারণে রাস্তায় যেনো যানজট সৃষ্টি না হয় এবং লোকজন যেনো মাহফিলের স্থান চিনতে ভুল না করে, এ জন্যে বাংলাদেশী নাগরিকদের রাস্তায় দায়িত্ব পালনেরও সুযোগ দিয়েছিলো স্থানীয় প্রশাসন। প্রসঙ্গক্রমে আমি বাংলাদেশে আমার তাফসীর মাহফিল সম্পর্কে কিছু তথ্য উল্লেখ করতে চাই।

বিভিন্ন সরকারের আমলে তাফসীর মাহফিল

ইতোপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি, ১৯৭১ সনের পরে মরহুম শেখ মুজিবের শাসনামলেও কোরআনের তাফসীর মাহফিল বন্ধ করার মতো ধৃষ্টতা তৎকালীন সরকার দেখায়নি কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৯শে জুলাই ৫৪ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছিলো। আল্লাহ তা'য়ালা কারাগারেও আমাকে কোরআনের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সরকারীভাবে কোরআন তাফসীর মাহফিলে বাধা দেয়া হয়নি।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পরে ক্ষমতার শেষ দিকে এসে তিনি নানাভাবে কোরআন তাফসীর মাহফিল বন্ধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাংলাদেশের তাওহীদী জনতা সরকারী ষড়যন্ত্র আল্লাহর রহমতে ব্যর্থ করে দিয়েছিলো। সে সময় দেশের যেখানেই কোরআন তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে, সেখানেই সরকারী ইন্ধনে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা হরতাল ডেকে মাহফিল বানচাল করার অপচেষ্টা করেছে। হরতাল চলছে, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, মিল-কলকারখানা, দোকান-বিপণী বিতান ও ব্যবসা কেন্দ্র সবকিছুই বন্ধ। ফলে লোকজনের পক্ষে কোরআনের তাফসীর শোনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তারা দলে দলে মিছিল করে তাফসীর মাহফিলে এসেছে। প্রকারান্তরে হরতালও সফল হলো তাফসীর মাহফিলও চূড়ান্তভাবে সফল হলো।

ভয়েস অব আমেরিকার তদানীন্তন বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী সাহেব আমাকে জানিয়েছিলেন, মাহফিলকে কেন্দ্র করে গত এক বছরেই ৫৬ বার হরতাল ডাকা হয়েছিলো। একজন মানুষকে কেন্দ্র করে এক বছরে ৫৬ বার হরতাল আহ্বান করার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে ইতোপূর্বে ছিলো না।

সিলেটে আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে সিলেটের তাওহীদী জনতা কোরআন তাফসীর মাহফিল আয়োজন করলো। রাম-বামপন্থীরা হরতাল ডেকে মাহফিল বন্ধ করার জন্যে হরতাল আহ্বান করলো। আমি ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে মাওলানা সাইয়েদ কামাল উদ্দিন জাফরী সাহেবকে সাথে নিয়ে বিমানে সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

কিন্তু সিলেট এয়াপোর্টে সরকারী প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ বিমান থেকে আমাকে নামতে না দিয়ে ঢাকায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। পরে দুটো জীপ গাড়ি এবং একটি

বাসে ৮০ জন সাথী নিয়ে আমি সিলেটের উদ্দেশ্যে রাতে রওয়ানা করলাম। ফজরের নামাজের ওয়াক্তে সিলেটে পৌঁছলাম। সেদিন ছিলো মাহফিলের শেষ দিন। মাহফিলে উপস্থিত লোকজন তখন পর্যন্ত জানতেও পারেনি যে, আমি মাহফিলে উপস্থিত হবার জন্যে সিলেট পৌঁছেছি। মাগরিব নামাজ জামায়াত বদ্ধভাবে লোকজন আদায় করে সুন্নাত নামাজ আদায়ের জন্যে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এ সময় আমি মাহফিলের মঞ্চে উপস্থিত হলাম। উপস্থিত তাওহীদী জনতা সুন্নাত নামাজ আদায় করে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখেই আনন্দে উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে কেঁদে উঠলো।

চট্টগ্রাম তাফসীর মাহফিল থেকে সরকার আমাকে গ্রেফতারের উদ্যোগ নিয়েও আল্লাহর রহমতে ব্যর্থ হয়েছে। সড়ক ও আকাশ পথে আমাকে যেতে দেয়া হয়নি, কিন্তু মহান আল্লাহ ঠিকই আমাকে মাহফিলে উপস্থিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। এরশাদ সরকার নিত্য-নতুন কৌশলে মাহফিল বানচাল করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সরকারীভাবে ঘোষণা দিয়ে মাহফিল বাতিল করার সাহস পায়নি।

এরশাদ সরকার বিদায় নেয়ার পরে বিএনপি সরকারের শাসনামলেও রাম-রামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষরা মাহফিল বন্ধ করার ঘৃণ্য চেষ্টা করেছে। মাহফিল চলাকালে আমাকে লক্ষ্য করে গুলী-বোমা ছুড়া হয়েছে। এরপরেও অগণিত অসংখ্য মানুষ পিন-পতন নীরবতার মধ্য দিয়ে কোরআনের তাফসীর শুনেছে।

এরপর ১৯৯৬ সনের নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ প্রশাসনে লুকিয়ে থাকা ধর্মনিরপেক্ষদের সাথে চক্রান্ত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পরে ১৪৪ ধারা জারী করে মাহফিল বন্ধ করার অপচেষ্টা করেও সফল হয়নি। শেখ হাসিনার প্রধান মন্ত্রীত্বকালে চট্টগ্রাম তাফসীর মাহফিল বানচাল করার উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়।

সেদিন ছিলো শবেবারাত। প্রত্যেকটি মসজিদই মুসল্লী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। প্রায় সকল মসজিদ থেকে মাহফিলের দাবীতে মুসল্লীগণ মিছিল করে রাস্তায় নেমে আসে। আওয়ামী সরকার তাওহীদী জনতার ওপর নির্যাতন চালিয়ে শতাধিক লোককে গ্রেফতার করে তাদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠায়।

ফলে সমগ্র চট্টগ্রামবাসী ফুঁসে ওঠে। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার বাধ্য হয়ে চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়ামে মাহফিলের অনুমতি দেয়। পাঁচ দিনব্যাপী মাহফিলের শেষের দিনে রাত ১০টার মধ্যে চট্টগ্রাম শহর বিপুল জনসমাগমের কারণে কার্যত অচল হয়ে যায়।

চট্টগ্রাম তাফসীর মাহফিল

প্রতি বছর পাঁচ দিন ধরে বিগত ২৮ বছরব্যাপী চট্টগ্রামে কোরআন তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবার মাহফিল হলে তা ২৯ বছর অতিক্রম করতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই মাহফিল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রামে পবিত্র কোরআনের তাফসীর শোনার জন্যে যে অগণিত মানুষের বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, পবিত্র কোরআন তাফসীরের এত বড় সমাবেশ পৃথিবীর অন্য কোথাও হয় না।

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ- চট্টগ্রামের উদ্যোগে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। **সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন মাওলানা শামসুদ্দিন** এই জনকল্যাণধর্মী সংগঠনের সভাপতি। তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত হয় চট্টগ্রামে ঐতিহাসিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিল। সংগঠনটি শুধু তাফসীর মাহফিলেরই আয়োজন করে না, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, সেলাই শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হস্তশিল্প প্রশক্ষিণ কেন্দ্রসহ নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং চিকিৎসা কেন্দ্র ও হজ্জ প্রশিক্ষণ এই সংগঠন পরিচালিত করছে। নওমুসলিমদের পুনর্বাসন, কর্মহীন বেকারদের কর্মসংস্থান, দুস্থদের সাহায্য করা, যৌতুক বিহীন বিয়ের আয়োজন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদগ্রস্থ লোকদের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ করে আসছে চট্টগ্রামের **ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ**।

আমাকে প্রধান মুফাস্‌সীর করে ২৯ বছর পূর্বে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল ময়দানে। উক্ত ময়দানে সমবেত লোকজনের স্থান সঙ্কুলান হয় না বিধায় পরবর্তী বছর তাফসীর মাহফিল চট্টগ্রাম কলেজিয়েট ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো। এই ময়দানে পর পর পাঁচ বছর মাহফিল হলো, এখানেও স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিলো না। মানুষ রাস্তা-পথে জমায়েত হয়ে মাহফিল শুনতো। এরপর থেকে কর্তৃপক্ষ কোরআন তাফসীর মাহফিল প্যারেড ময়দানে স্থানান্তর করলেন।

চট্টগ্রাম তাফসীর মাহফিলে পবিত্র কা'বা শরীফের সম্মানিত ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আস সুবাইল দুই বার তাশরীফ এনেছেন। মিসরের জামে আল আযহার, কুয়েত, কাতার, আরব আমীরাত, মালয়েশিয়া, বার্মা, ইন্ডিয়া, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহ ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ এ মাহফিলে অংশগ্রহণ করে মাহফিল অলঙ্কৃত করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের হাইকোর্টের বিচারপতিও এই মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছেন। চট্টগ্রাম মাহফিল

উপলক্ষ্যে উপস্থিত জনগণ মহাপবিত্র কা'বা শরীফের সম্মানিত ইমামের পিছনে নামাজ আদায়ের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

চট্টগ্রাম মাহফিলে শুধু বাংলাদেশের জনগণই অংশগ্রহণ করে না, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, বার্মাসহ সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকেও বাংলাদেশী প্রবাসীগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অসংখ্য নারী-পুরুষ চট্টগ্রাম মাহফিলে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকেন। চট্টগ্রামের আবাসিক হোটেলসমূহ মাহফিলের প্রায় এক মাস আগে থেকেই বুকিং দেয়া হয়। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িগুলো আগত মেহমান দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়।

এই মাহফিলের শ্রোতা হিসেবে শুধু মুসলিমগণই আসেন না, বহু সংখ্যক অমুসলিমও মাহফিলে কোরআনের কথা শোনার জন্যে আসেন এবং কোরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম কবুল করে মহাসত্যের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিগত ২৮ বছরে প্রায় পাঁচ শতাধিক অমুসলিম এই মাহফিলে কোরআনের তাফসীর শুনে আমার হাতে ইসলাম কবুল করেছেন– আল হাম্‌দুলিল্লাহ্। প্রতি বছর পাঁচ দিনব্যাপী মাহফিলের শেষ দিন লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের সমাগম হয়। মাহফিলের মূল প্যান্ডেল থেকে ময়দানের চারদিকে অন্ততঃ তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে মানুষের স্রোত উপ্‌চে পড়ে জনসমুদ্রে পরিণত হয়। শেষ দিনের মোনাজাতে নয়নাভিরাম এক জান্নাতী দৃশ্যের অবতারণা হয়। দুই হাত তুলে অগণিত মানুষ অনুতাপে নতশীরে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকে। শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ ও নারীর অশ্রুধারায় তাদের বুক ভিজে যায়। এই দৃশ্য চোখে দেখা আর হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মতো, ভাষায় ব্যক্ত করা খুবই কঠিন।

ইসলাম বিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষরা অভিযোগ করে থাকেন যে, মাহফিলে আমি শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে থাকি। আমি বিনয়ের সাথে প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই, আমার রাজনৈতিক বক্তব্য শুনে না কোরআনের তাফসীর শুনে অমুসলিমগণ ইসলাম কবুল করে থাকেন? রাজনৈতিক বক্তব্য শোনার জন্যে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ কেনো কোরআন তাফসীর মাহফিলে আসবে? রাজনৈতিক বক্তব্য শোনার জন্যে রাজনৈতিক সমাবেশগুলোই তো যথেষ্ট। আমার তাফসীর মাহফিল গুলোয় শ্রোতাবৃন্দ রাজনীতির আলোচনা শুনতে ভীড় করে না তাফসীর শুনতেই আসেন। এ জন্যই প্রতি মাহফিলেই লোক সমাগম হ্রাস না পেয়ে বরং প্রতি বছরই পূর্বের তুলনায় লোক সমাগম বৃদ্ধিই পেতে থাকে। আর এটাই হলো পবিত্র কোরআনের জীবন্ত মুজিজা।

একটি ছোটোখাটো রাজনৈতিক সমাবেশের আয়োজন করতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, তা রাজনৈতিক দলগুলো ভালোই জানে। শ্রোতাদেরকে আসা-যাওয়ার ভাড়াসহ ক্ষেত্র বিশেষে বিরিয়ানীর প্যাকেটও দিতে দেখা যায়। কোরআনের তাফসীর মাহফিলে যে পরিমাণ জনসমাগম হয়, ইসলাম বিবর্জিত রাজনৈতিক দলগুলো প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এর সমকক্ষ লোক সমাগম করা তাদের জন্যে অবশ্যই সুকঠিন। তাফসীর মাহফিলে যারা আসেন, তাদের আসা-যাওয়ার ভাড়া দেয়া দূরে থাক, কর্তৃপক্ষ সকল মানুষকে বসার জায়গাও দিতে পারেন না। মানুষ মাহফিলের আশেপাশের স্থাপনার ছাদে এবং গাছের শাখায় পর্যন্ত অবস্থান নিয়ে পবিত্র কোরআনের তাফসীর শুনে থাকেন।

কখনো কখনো বৃষ্টির কারণে মাহফিলের মাঠ কর্দমাক্ত হয়ে যায়। কখনো বসার স্থানে পর্যন্ত পানি জমে যায়। একদিকে প্রবল বৃষ্টি অন্য দিকে বসার স্থানে পানি, এই অবস্থায় অগণিত মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাক ভেজা হয়ে কোরআনের তাফসীর শুনেছে, এমন বিরল দৃষ্টান্তও বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনতা স্থাপন করেছে।

অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, মাহফিলের নামে চাঁদাবাজী করা হয়। বিগত ২৮ বছর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে, সারা বাংলাদেশের একজন নাগরিকও এ কথার প্রমাণ দিতে পারবে না যে, তাফসীর মাহফিলের জন্যে কারো কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে টাকা আদায় করা হয়েছে। বরং চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট শিল্পপতিগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই মাহফিল কর্তৃপক্ষের কাছে টাকা পাঠিয়ে দেন। আর এটাই বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশ দ্বার কোরআন প্রেমিক বীর চট্টলাবাসীর ঐতিহাসিক ঐতিহ্য।

সামান্য বাদাম বিক্রেতা, চা বিক্রেতা, ঠেলাগাড়ী ও রিক্সাওয়ালা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে উপার্জন করেন, কোরআনের কথা শোনার জন্যে তাঁরা তাদের উপার্জন থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঁচ টাকা হলেও পৌঁছে দেন। প্রবাসী মুসলমানগণ টাকা পাঠিয়ে দেন, এমনকি মহিলারা নিজের প্রিয় গহনা পর্যন্ত দান করেন। মাহফিল উপলক্ষ্যে অসংখ্য বুক স্টল বানানো হয়, যারা এসব স্টলে বই সাজিয়ে বসেন তাঁরা স্বতস্ফূর্তভাবে কর্তৃপক্ষকে মাহফিলের জন্যে টাকা দেন। রাজনীতির নামে চাঁদাবাজী করে জীবিকার ব্যবস্থা করা ছাড়া যাদের কোনো গতি নেই, কেবলমাত্র তারাই কোরআনের মাহফিল সম্পর্কে চাঁদাবাজীর অভিযোগ তোলে।

সরকারীভাবে দেশের জনগণকে বই পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে বই মেলার আয়োজন করা হয় এবং সেখানে সরকারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত

হয়ে বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে পাঠকদের অনুপ্রাণিত করে থাকেন। তাফসীর মাহফিল উপলক্ষ্যে বইমেলার আয়োজন করা হয়। অসংখ্য প্রকাশকগণ বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন। মাহফিল উপলক্ষ্যে তাঁরা নতুন নতুন বই প্রকাশ করেন। মাহফিলের বইমেলায় পাঠকগণ লাইন দিয়ে বই কিনেন। মাহফিল উপলক্ষ্যে দেশে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতে জনগণের জ্ঞান-ভান্ডারও সমৃদ্ধ হয় এবং পুস্তক ব্যবসায়ীগণও লাভবান হন। মহিলাদের বই কেনার জন্যে মাহফিল কর্তৃপক্ষ পৃথক সময় নির্ধারণ করে থাকেন। যাতে করে মহিলারা পুরুষ ক্রেতাদের ভীড়ে বিব্রতবোধ না করেন।

কোরআনের তাফসীর মাহফিলের কারণে দেশের পুস্তক ব্যবসায়ী, প্রেস মালিক, কাগজ ব্যবসায়ীগণ অর্থাৎ পুস্তক প্রকাশের সাথে যারা জড়িত, তাঁরা ছাড়াও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণও লাভবান হন। কারণ অগণিত নারী-পুরুষের সমাগমে তাফসীর মাহফিল চট্টগ্রামবাসীর জন্যে প্রতি বছর ঈদ-আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সারা দুনিয়ার যে দেশেই বাংলা ভাষাভাষী মানুষ রয়েছে, সে দেশেই চট্টগ্রাম মাহফিলের অডিও-ভিডিও ক্যাসেট ও সিডি রয়েছে। যারা স্বশরীরে মাহফিলে উপস্থিত হতে পারেন না, তাঁরা অডিও-ভিডিও ও সিডির মাধ্যমে কোরআনের তাফসীর মাহফিল শুনেন ও দেখে থাকেন। তাফসীর মাহফিল শুনে অসংখ্য মানুষ নিজের চরিত্র থেকে দোষক্রটি দূর করেন। বহু সংখ্যক নেশাখোর মাদক ছেড়েছে, ঘুষখোর ঘুষ ছেড়েছে, সন্ত্রাসী সন্ত্রাস ছেড়েছে, ব্যভিচারী ব্যভিচার ছেড়েছে, ধর্ষক নারীর সতীত্বের রক্ষক হয়েছে, মিথ্যাবাদী মিথ্যা ছেড়েছে। বেনামাজী নামাজী হয়েছে, রোজা পালনে অভ্যস্ত হয়েছে, বহু পর্দাহীন নারী পর্দা করা শিখেছে, কোরআন তিলাওয়াত শিখেছে, নাস্তিক আস্তিক হয়েছে, বহু মানুষের মনে ইসলামকে জানার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করছে।

রাম-বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ, দুর্নীতিবাজ, সুদখোর, রাজনৈতিক ব্যবসায়ী, ধর্ম ব্যবসায়ী এবং জনগণের নাম ভাঙিয়ে বিদেশ থেকে টাকা এনে যারা বিলাস-বহুল জীবন-যাপন করে সুশীল সেজেছেন, এসব দৃশ্য দেখে তাদের মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠাই স্বাভাবিক। কারণ দেশের জনগণ সজাগ-সচেতন ও সতর্ক হলে এসব লোকজনের বিলাসিতায় বিঘ্ন ঘটবে। এ কারণেই তারা কোরআন তাফসীর মাহফিলের বিরুদ্ধে নানা ধরণের কল্পিত অভিযোগ তুলে মাহফিল বন্ধ করার ষড়যন্ত্র অব্যহত রেখেছে।

তাফসীর মাহ্ফিল ২০০৭

১১ই জানুয়ারী ২০০৭-এ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর চট্টগ্রাম ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ সরকারী নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে তাফসীর মাহফিলের জন্যে যথারীতি আবেদন জানায়। এমনকি মাহফিল কর্তৃপক্ষ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্র সচিব, আইজিপিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের কাছে লিখিত আবেদন জানালে শর্ত সাপেক্ষে মাহফিলের অনুমতি দেয়া হয়। মাহফিল কর্তৃপক্ষ সরকার প্রদত্ত সকল শর্ত মেনে নেয়ার অঙ্গিকার পত্রে স্বাক্ষর করে।

বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার চট্টগ্রাম তাফসীর মাহফিলের অনুমতি দেয়ার সাথে সাথে কর্তৃপক্ষ দ্রুত মাহ্ফিল বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যান। বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষী মানুষ তাফসীর মাহফিল সম্পর্কে চরম উৎকণ্ঠায় ছিলেন। প্রত্যেক দিনই কর্তৃপক্ষসহ আমার কাছে দেশ-বিদেশ থেকে অগণিত মানুষ ফোন করে মাহফিল সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। মাহফিলের অনুমতি দেয়া হয়েছে শুনে তাঁরা মহান আল্লাহ্র শোকর আদায় করেছেন।

মাহফিলের অনুমতি দেয়ার সাথে সাথে ঢাকা আর, কে মিশন রোড থেকে ইসলামের ছদ্মাবরণে প্রকাশিত পত্রিকা ইসলাম বিদ্বেষী আরো কয়েকটি পত্রিকার সাথে সিন্ডিকেট করে চট্টগ্রামের তাফসীর মাহফিল সম্পর্কে পরিকল্পিত রিপোর্ট প্রকাশ করতে থাকে। সাংবাদিকতার সার্বজনীন নীতি-নৈতিকতা ও সততার মাথায় পদাঘাত করে (Yellow Journalism) **'হলুদ সাংবাদিকতায়'** ইসলাম বিদ্বেষী পত্রিকা সমূহকেও হার মানিয়েছে উক্ত পত্রিকাটি ও তার সম্পাদক।

সরকারী কর্তৃপক্ষও এসব কল্পিত ও মিথ্যা রিপোর্ট স্থানীয়ভাবে যাচাই-বাছাই না করেই মাহফিলের অনুমতি বাতিল করেছে বলে অনুমিত হয়। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো যখনই মাহফিলের অনুমতি বাতিল করা হলো, তখন তাওহীদী জনতা যেনো প্রবল আঘাতে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো। দেশে প্রচলিত আইনের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধাশীল থেকে নীরবে শুধু অশ্রুই বিসর্জন দিয়েছেন, কোনো ধরণের বিক্ষোভ দেখাননি।

সচেতন জনগণের প্রশ্ন

২০০৭ সনে অনুষ্ঠিতব্য চট্টগ্রাম তাফসীর মাহফিল বানচাল করার উদ্দেশ্যে ঢাকা আর, কে মিশন রোড থেকে ইসলামের ছদ্মাবরণে প্রকাশিত পত্রিকাটি কতিপয় ইসলাম বিদ্বেষী পত্রিকার সাথে সিন্ডিকেট করে মাহফিলের বিরুদ্ধে নানা ধরণের কল্পিত অভিযোগের সাথে এই অভিযোগ তোলে যে, এই মাহফিল উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী- শিল্পপতি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র দোকানদারদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে প্রত্যেক বছরই জোরপূর্বক চাঁদাবাজী করা হয়।

বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে সচেতন দেশবাসীর প্রশ্ন, উক্ত পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ গঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত চাঁদাবাজীর অভিযোগ না তুলে উক্ত পত্রিকাটি মাহফিল আয়োজন সম্পর্কিত সংবাদ, প্রদত্ত বক্তব্য এবং মাহফিলের ছবি গুরুত্ব সহাকারে ছাপিয়ে কেনো সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে?

ভীতি ও হুমকী প্রদর্শন এবং পেশীশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ আদায় করেই যদি প্রত্যেক বছর কোরআন তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করা হয়ে থাকে, তাহলে এ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আকারের একটি সংবাদও দেশবাসীর অবগতির স্বার্থে **বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ** গঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কেনো ছাপালেন না?

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরীতে ২৯ বছর যাবৎ ইসলামী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে কোরআন তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমে কমলাপুর রেলওয়ে ময়দানে, পরে মতিঝিল গভর্ণমেন্ট স্কুল মাঠে এর পরে পল্টন ময়দানে। সিলেটে আঞ্জুমানে খেদমাতুল কুরআন-এর পক্ষ থেকে মাহফিল হচ্ছে বিগত ৩২ বছর যাবৎ। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে বিগত ২৮ বছরব্যাপী। এসবগুলো তাফসীর মাহফিলে প্রতি বছর আমাকেই প্রধান মুফাস্সীর হিসেবে দাওয়াত দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত বছর যাবৎ চাঁদাবাজীর মাধ্যমে কোরআন তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করা হলো, অথচ সরকারের পুলিশ প্রশাসন এবং গোয়েন্দা বিভাগসমূহ চাঁদাবাজীর ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলেন না, শুধু জানতে পারলেন ঢাকা আর, কে মিশন রোড থেকে ইসলামের ছদ্মাবরণে প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদক এবং তাঁর সিন্ডিকেট করা সংবাদ পত্রসমূহ?

অবশ্য আমাদের দেশের জনগণ অবুঝ নন, তাঁরাও ঐ পত্রিকাটির প্রতি ইতোমধ্যেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন শুরু করেছেন এবং পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষও নিশ্চয় তা টের পাচ্ছেন। কারণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অহরহ লেখার জন্যে ঢাকা নিউ ইস্কাটনের একটি পত্রিকা যেখানে একাই একশো, সেখানে একই খিস্তি-খেউড় পড়ার জন্যে জনগণ পয়সা দিয়ে আরকে মিশন রোড-ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি কিনবে কোন্ দুঃখে!

রিয়াদ মাহফিলে আমি যা বলেছি

আজ ঐতিহাসিক ২৬শে মার্চ। মহান স্বাধীনতা দিবস। আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিন। এ জন্যে আমি আমার আলোচনার সূচনায় আমাদের প্রিয় জন্মভূমি স্বাধীন করার লক্ষ্যে যারা যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিলেন, সেসব বীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব চিরস্থায়ী করার জন্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আবেদন জানিয়ে আমি মূল আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম, সকল দেশের নাগরিকদের মধ্যেই ভালো-মন্দ উভয়েই রয়েছে। আমি পত্র-পত্রিকাতেও পড়েছি এবং সাউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে এসেও জানতে পারলাম, বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোকজন এদেশের আইন অমান্য করে বিশৃংখলা করে থাকে। কেউ কেউ মাদক সেবন করে, জুয়া খেলে এবং দাঙ্গা-ফাসাদেও লিপ্ত হয়।

অধিকাংশ জায়গায় বাংলাদেশীরা একত্রেই বাস করে। সাথের কেউ বেতন পেয়েছে অথবা কিছু অর্থ জমিয়েছে দেশে পাঠানোর জন্যে, আরেকজন অর্থ আত্মসাৎ করার জন্যে তাকে হত্যা পর্যন্ত করছে। লাঠি-সোঠা বা তরকারী কাটা ছুরি নিয়ে নিজেরা নিজেরা রাস্তায় মারামারিও করছে। মারামারি থামানোর জন্যে সাউদী পুলিশ এগিয়ে এসেছে, দুইজন পুলিশকে পর্যন্ত হত্যা করেছে কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল বাংলাদেশী।

আমি সাউদী আরবের আলউলা প্রদেশে বাংলাদেশীদের সমাবেশে যে কথাগুলো বলেছিলাম, সে কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করে এখানে বললাম, আদম শুমারীর খাতায় পরিচিতি হিসেবে **'মুসলিম'** শব্দটি উল্লেখ থাকলেই সাউদী সরকার বাংলাদেশীর প্রাধান্য দিবে না। আচরণও মুসলমানের মতো হতে হবে। কর্মীর প্রয়োজনে এ দেশের সরকার অন্যান্য দেশের নাগরিকসহ বাংলাদেশীদের এদেশে আসার সুযোগ দিয়েছে। তারা এদেশে কর্মরত সকল দেশের নাগরিকদের প্রতিই দৃষ্টি রাখছে। কর্মী হিসেবে কে দক্ষ, আচরণ-ব্যবহারে কে উত্তম এবং স্বভাবে কে শান্তিপ্রিয়, এসব বিষয় এ দেশের সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে।

কর্মের ক্ষেত্রে অলস-অকর্মা, আচরণ-ব্যবহারে উচ্ছৃংখল ও স্বভাবে ঝড়গাটে, এমন ধরণের লোক নিজ দেশের জন্যেই বোঝা বিশেষ। ভিন্ন দেশে এমন লোককে প্রশ্রয় দেয়া হবে না এটাই স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে, প্রবাসে প্রত্যেকটি নাগরিকই নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। বাংলাদেশী নাগরিকগণ যদি ভিন্ন দেশে নিন্দিত হন, তাহলে সেই দেশের জনগণের মনে বাংলাদেশের জনগণ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে। কর্মক্ষেত্রে তারা ভিন্ন দেশের নাগরিকদের প্রাধান্য দিবে। সুতরাং গুটিকতক উচ্ছৃংখল ও দুষ্কৃত প্রকৃতির লোকদের জন্যে সমগ্র দেশকে নিন্দিত হতে দেয়া যাবে না।

লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক সউদী আরবে কর্মরত রয়েছে। তাদের উপার্জিত অর্থে আমার দেশে অসংখ্য পরিবার জীবন ধারণ করছে, অসংখ্য ছেলেমেয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হচ্ছে। এসব লোকদের বেকার করে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের ধারা বন্ধ করার মতো অপতৎপরতা যারা চালাবে, আপনারা তাদের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখুন। এদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করুন। অপরাধ প্রবণ লোক যদি নিজেকে সংশোধন না করে তাহলে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে অপরাধীকে ধরে এদেশের পুলিশের হাতে তুলে দিন।

এ কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আগামী ২৭তারিখে রিয়াদে আরব লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সমগ্র নগরী জুড়ে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কোনো ধরণের আলোচনা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। আল হাম্‌দুলিল্লাহ্‌, আমাকে মাহফিলে বক্তৃতা রাখার শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি, বরং সরকারী ব্যবস্থাপনায় মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। সউদী সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি অসংখ্য বাংলাদেশী মাহফিলের শৃংখলা বজায় রাখার জন্যে স্বেচ্ছা সেবকের ভূমিকা পালন করেছে।

দূর-দূরান্ত থেকে যেসব বাংলাদেশী গাড়ি বহর নিয়ে মাহফিলে যোগ দেয়ার জন্যে এসেছে, তারা যেনো পথ হারিয়ে কোরআনের আলোচনা শোনা থেকে বঞ্চিত নয়, এ জন্যে রিয়াদ নগরীর বিভিন্ন পথে পথে বাংলাদেশী নাগরিকগণ ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভিন্ন আঙ্গিকে মহিলা মাহফিল

বাংলাদেশে বিভাগীয় শহরসমূহে এবং জেলা শহরে অগণিত মহিলা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব মাহফিলে এত বিপুল সংখ্যক মহিলা যোগ দিয়েছেন যে, মাহফিল শেষে যেদিকেই দৃষ্টি পড়েছে সেদিকেই বোরখা আবৃতা মহিলাদের স্রোত দেখা গিয়েছে। আমার দেশের সেই প্রিয় দৃশ্য আমার দৃষ্টিতে পড়লো সাউদী আরবের রাজধানী রিয়াদ শহরে। আশেপাশে বসবাসরত মহিলাগণ যিনি যেভাবে পেরেছেন মাহফিলে যোগ দিয়েছেন। আর দূর-দূরান্ত থেকে গাড়ি যোগে যারা এসেছেন, সেই গাড়ির সংখ্যাই ছিলো সহস্রাধিক।

২৭শে মার্চ একটি বিশাল কমিউনিটি সেন্টারে মহিলা মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিলো। এটাকে শুধু কমিউনিটি সেন্টার বললে ভুল হবে। এখানে আগত মেহমানদের সকল প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যে পৃথক স্থানে নানা ধরণের খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাদের সাথে শিশু রয়েছে, তারা শিশুদেরকে খেলার স্থানে দিয়ে নির্বিঘ্নে বক্তব্য শুনেছেন।

কর্তৃপক্ষ শিশুদের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখছেন, খেলায় সহযোগিতা করছেন এবং মাঝে মধ্যে রকমারী চকলেট দিয়ে শিশুদের আনন্দ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করছেন। খেলার সুযোগ আর প্রিয় চকলেট পেয়ে শিশুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে এমনভাবে মেতে ছিলো যে, নিজের মা'কে তারা বিরক্ত করার সুযোগই পায়নি। আমি মহিলাদের উদ্দেশ্যে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং নিজ সন্তানকে আদর্শ মুসলিম নাগরিক হিসেবে গড়া সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, পিন পতন নীরবতার মধ্য দিয়ে আগত মহিলাগণ কোরআন-হাদীসের আলোচনা শুনলেন।

আজ এই রিয়াদেই দুই দিনব্যাপী আরব লীগ সম্মেলন শুরু হয়েছে। এবারের সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে। সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের ওপর চলছে নির্যাতন। প্রত্যেক দিন ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্থান ও সোমালিয়ায় আন্তর্জাতিক স্বঘোষিত মোড়ল আমেরিকা মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। ইরান ও সিরিয়ার ওপর রক্তলোলুপ হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আমেরিকা জিহ্বা বিস্তার করেছে। পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটে রিয়াদে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আরব লীগ সম্মেলন। এই সম্মেলন মুসলমানদের পক্ষে কি ভূমিকা রাখে, তা দেখার জন্যে আমি অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।

নিশ্চল উপত্যকায় প্রবহমান স্রোতস্বিনী

আজ ২৮শে মার্চ। ইশার নামাজ শেষে সুধী এবং ওলামা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। আলেম-ওলামাদের সম্মুখে কথা বলার সুযোগ এলেই আমার মন মানসিকতা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কারণ বর্তমান দুনিয়ায় আলেম ওলামাগণই সবথেকে বেশী অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হবার কারণে সর্বত্রই তাঁরা অবমূল্যায়নের শিকার এবং অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজ ও দেশে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারছেন না। আবার ঈমান ও নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে অবৈধ পথেও এগিয়ে যেতে পারেন না। ফলে আল্লাহ বিমুখ জাতীয় চরিত্র হননকারী প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী **'দস্যু-তস্করদের'** অনুগ্রহের পাত্র হয়ে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতে হচ্ছে।

কেনো তাঁরা বর্তমান পৃথিবীতে স্বয়ং নিজ সম্প্রদায় মুসলমানদের কাছেই অবহেলিত, এর একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। আমি ওলামা সম্মেলনে এ বিষয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আমি আমার আলোচনায় উল্লেখ করেছি, এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, বিশ্বজুড়ে আজো মুসলিম সমাজে সততা স্বচ্ছতা, সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা, একে অপরের প্রতি কর্তব্যবোধ, মায়া মমতা, সহানুভূতি, আমানতদারী, দ্বীনদারী, আল্লাহভীতিসহ মৌলিক মানবিক গুণাবলী যতটুকুন অবশিষ্ট রয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ওলামা মাশায়েখ ও দ্বীনি সংগঠনের অবদান। তবুও হাতী যেমন তার চক্ষু ক্ষুদ্র হবার কারণে তার দেহের আকার ও শক্তি-মত্তা বুঝতে সক্ষম হয় না, তদ্রুপ দেশের সম্মানীত ওলামা সমাজ নানাবিধ সঙ্কীর্ণতার কারণে জনগণের ওপর তাঁদের প্রভাব-মর্যাদা কত গভীরে তা সকলে সমভাবে অনুধাবন করতে পারেন না। কলসী কখনো খালি থাকেনা, হয় পানি নয়তো বাতাস। ঠিক একই ভাবে জনগণের নেতৃত্বের আসন কখনো শূন্য থাকে না, হয় সৎ-যোগ্য, না হয় অসৎ অযোগ্য– কেউ তো বসবেই। দুর্ভাগ্য জাতির জন্য তখনই হয় যখন ইমাম নিজস্থান ছেড়ে মুক্তাদীর কাতারে দাঁড়ায়– আর সুযোগ বুঝে ইমামতের জন্য অযোগ্য কোনো মুক্তাদী ইমামতের শূন্য জায়গা পূর্ণ করে।

বর্তমান সময়ে ওলামা সমাজের একটি বিরাট অংশ নিজেদের স্বর্ণালী ইতিহাস ভুলে গিয়ে আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে **'ছামানান কালীলা'**য় পরিতুষ্ট হচ্ছেন এবং জাতির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলতে বসেছেন। মাদ্রাসায়

শিক্ষকতা, মসজিদে ইমামত, জানাযা বা বিবাহ পড়ানো, অথবা ওয়াজ-নসীহত, ওলামা সমাজের দায়িত্ব কি এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ? অপ্রিয় হলেও এ বিষয়ে কিছু বাস্তব কথা আজ আমাকে বলতেই হবে।

দেশের ওলামা হাযারাত নিজেদেরকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমিত করার সুযোগে দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, শিল্পনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি এক কথায় মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিশাল অঙ্গন ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থীদের দখলে চলে গিয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রেই দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। এ সকল ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া রাজত্ব এবং ক্ষেত্র বিশেষে দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকজন এবং বামপন্থীগণ ওলামা সমাজের কোরআন-হাদীস ভিত্তিক স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রেও অযাচিত হস্তক্ষেপ করছে। আর এ কারণেই দেশের জনগণকে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তাবীজ, দোয়া, জানাযা, মাসলা-মাসায়েল এবং বিবাহ-তালাকের বিষয়ে তারা হুজুরদের স্মরণাপন্ন হয় আর জীবনের বিশাল অঙ্গন পরিচালনার জন্য ফাসিক-ফুজ্জার ও ইসলামের চরম শত্রুদের দ্বারস্থ হতে হয়। প্রশ্ন হলো, এ ক্ষেত্রে কি ওলামা সমাজের কোনোই দায়িত্ব নেই?

নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে সমকালীন লোকজন এসে যদি জিজ্ঞাসা করতেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি হৃদরোগে আক্রান্ত, আমি শ্বাস কষ্টের রোগী, আমার মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, আমার পেট খারাপ, আমার দেহে ঘা-পাচ্ড়া হয়েছে, আমি জ্বরে আক্রান্ত, আমার বিয়ের প্রয়োজন, আমি বিয়ে করেছি কিন্তু সন্তান হচ্ছে না, আমি ও আমার স্ত্রী ফর্সা, কিন্তু আমাদের সন্তান কেনো কালো বর্ণের হলো? আমার জমির উর্বরতা নষ্ট হয়েছে, ফসল হচ্ছে না, আমার ক্ষেতের ফসল পোকায় আক্রান্ত, খেজুর গাছে মড়ক লেগেছে, আমার পশুগুলো রোগাক্রান্ত, বৃষ্টির অভাবে ফসল হচ্ছে না, ঘী বা মধুর মধ্যে ইঁদুর পড়েছে, এখন কি করবো? এ ধরণের অসংখ্য পার্থিব সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন যদি সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে উত্থাপন করে সমাধান চাইতেন, তাহলে তিনি কি তাঁদেরকে এ কথা বলতেন যে, 'আমি আল্লাহর নবী, ওযু-গোসল, পাক-পবিত্রতা, নামাজ-রোজা, হজ্জ কালেমা, বিয়ে-তালাক, মৃত্যু ও কবরের আযাব, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয় ব্যতীত পার্থিব বিষয়ে আমার কাছে কেনো জানতে চাচ্ছো, এসবের আমি কি জানি?'

অথচ দূর-দূরান্ত থেকে আগত ও উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম এ ধরণের অগণিত পার্থিব বিষয়াদিও নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উত্থাপন করেছেন এবং তিনি এগুলোর সমাধানও দিয়েছেন, নেতিবাচক জবাব কখনো দেননি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাবই তিনি দিতেন। 'মাথার যন্ত্রণা থেকে শুরু করে যুদ্ধ পরিচালনা, রান্না ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা' এমন কোনো বিষয় উত্থাপিত হয়েছে বা এমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যার সমাধান তিনি দেননি?

ওলামায়ে কেরাম তো নায়েবে রাসূল, লোকজন তাদের কাছে শুধু তাবীজ আর ঝাড়-ফুঁকের জন্যে কেনো আসবে? মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিন্যাস পদ্ধতি, ভ্রুণের ক্রমবিকাশ, কম্পিউটার ব্রাউজিং, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ওয়েব সাইট, ভূমি কম্প, ভূমি ধ্বস, পাহাড়, মাটির স্তর, পানির স্তর, বায়ূ স্তর, ছায়া, আলো-আঁধার, সৌরজগৎ, বিগ-ব্যাং, বিগ-ক্র্যাঞ্চ, আলোক বৎসর, মিল্কিওয়ে, গ্যালাক্সি, এন্টিমিউটানেজিক আমব্রেলা, কসমিং ষ্ট্রীং, এসটিরয়েড বেল্ট, ব্লাকহোল, ওজন স্তর, টাইম জিরো, প্লাঙ্ক টাইম, প্রাইমোরডিয়াল ফায়ারবল, মহাশূন্য পরিচালনা পদ্ধতি, সাত রংয়ের সমাহার তথা রংধনু রহস্য, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ কি, সুদ মুক্ত ব্যাংকিং পদ্ধতি কিভাবে সম্ভব? অন-লাইন সিস্টেম কি? ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে? ইসলামী রাষ্ট্রে ভিন্নধর্মাবলম্বী নাগরিকগণ কেমন অধিকার ভোগ করবেন? নারী, শিশু, কিশোর, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শ্রমিক-মালিক, মেহনতী জনতা এদের কি অধিকার দিয়েছে ইসলাম?

এসব মৌলিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ওলামা সমাজের কাছে কেনো করা হয় না? এর কারণ কি? আর যদি কেউ এসব প্রশ্ন করেই বসে তাহলে ক'জন এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হবেন?

আমি মনে করি মাদ্রাসার সিলেবাস ভুক্ত কতকগুলো কিতাব অধ্যয়ন করে কয়েকখানা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। সেই সাথে প্রয়োজন জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণের উচ্চাকাংখা এবং তার বাস্তবায়ন। তাহলেই সমাজ ও রাষ্ট্রকে ওলামাদের পক্ষ থেকে বাস্তবমুখী জীবনধর্মী কিছু অবদান রাখা সম্ভব হবে– যা করেছিলেন আমাদের অতীতের বিশ্ব বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দেসীন, মুফাচ্ছেরীণ, মুফাক্কেরীণ, সাল্ফে সালেহীন, আকাবেরে দ্বীন ও বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণ। তাঁরা মানুষের সার্বিক ইস্লাহ্ তথা সংশোধন-সংস্কারের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনা করেছেন, বক্তব্য রেখেছেন, দেশ-বিদেশ সফর করেছেন, হিজরত করেছেন ও জেল জুলুম সহ্য করেছেন। ইসলাম আক্রান্ত হতে পারে– এমন সকল দরজায় কলমের তরবারী হাতে নিয়ে তাঁরা অহর্নিশ ঈমান ও আকীদার ঘর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহারা

দিয়েছেন। এমনকি ফাঁসির মঞ্চে আরোহন করতেও দ্বিধা করেননি। তবুও বাতিলের সাথে অসম্মানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেননি এবং স্বার্থের বিনিময়ে মাথানত করেননি।

জাতির চরম দুর্ভাগ্য, সেই জগৎ বিখ্যাত ওলামাদের উত্তরসুরীরা আজ শতধা বিভক্ত বিচ্ছিন্ন। তাদের কেউ ছুটছেন ক্যামেরা নিয়ে মাজারে, কেউ ছুটছেন জশ্নে জুলুশের পতাকা হাতে বাজারে, কেউ মিলাদ, কেউ শবে-বরাত, কেউ গোল টুপী, কেউ লম্বা টুপী, কারো জামার কোণা ফাঁড়া, কারো পাঞ্জাবীর পার্শ্ব জোড়া, কেউ কওমী, কেউ বা আলীয়া। সবমিলে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খা-লিয়া।

'রুহামাউ বাইনা হুম'এর পরিবর্তে **'আশিদ্দাউ বাইনা হুম'** বহুল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এই সুযোগে সুচতুর ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থীরা বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্যে, গানে-নাটকে, যাত্রা-থিয়েটারে, টিভি চ্যানেলে, সাইবার ক্যাফে, ইন্টারনেটে, পত্র-পত্রিকায় সবশেষে মোবাইলের ফ্রী টক-টাইমের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের লক্ষ-কোটি যুবক-যুবতীদেরকে অবৈধ প্রেম, লিভ-টুগেদার ও সমকামীতার মতো ঘৃণ্য কাজের প্রতি আকৃষ্ট করছে এবং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যার যার নিজস্ব ধর্মে বিশ্বাসী থেকেই নারী-পুরুষ বিয়ের নামে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

ফলে ইসলামের পুত-পবিত্র আদর্শ ছেড়ে দেশের ভবিষ্যৎ জেনারেশন হ্যামিলনের বংশী বাদকের ঐন্দ্রজালিক সুরে ছুটে চলছে নিশ্চিত পতন সাগরের দিকে। যার তুলনা চলে সাড়ে সাত'শ বছর স্পেনে মুসলিম শাসনের করুণ পরিণতির সাথে।

এ অবস্থা আর দীর্ঘ দিন চলতে দেয়া যায় না। দেশের চৌদ্দ কোটি মুসলমানদের ভাগ্য দ্বীনি ধ্যান-ধারণা বিবর্জিত ইসলাম বিদ্বেষী চরম বদ্ কিস্মত বামদের হাতে তুলে দেয়া যায় না। বামদের হতভাগ্য বললাম এই কারণে, এদের মা-বাবা এদের নাম রেখেছিলেন সুন্দর সুন্দর মুসলমানী নাম। কিন্তু এরা এতই কপাল পোড়া– নামাজ আদায় করে না, ধনাঢ্য কিন্তু হজ্জ করে না। আল্লাহ-রাসূল, পরকাল, জান্নাত জাহান্নামে আস্থা রাখে না। নবী-রাসূলদের ছেড়ে কালমার্কস, লেনিন, মাও এদের কাছে অধিকতর প্রিয় এবং আলেম-ওলামা এদের জানের দুশমন। ইসলামী সংগঠনের নাম শুনলে এদের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়।

যাই হোক, আমি তেমন কোনো আলেম নই। তাই ওলামায়ে কেরামকে উপদেশ দেয়ার 'গোস্তাখী' আমি কখনো করতে চাই না– আমি যা করছি তা হচ্ছে, তাঁদের ভুলে যাওয়া ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাঁদের কেউ কেউ পরিস্থিতির কারণে

হতাশা ও হীনমন্যতায় ভুগছেন,.কেউ কেউ নিজের অজান্তে ফরজ ফেলে মুস্তাহাবের পেছনে ছুটছেন, এ সকল বিষয়গুলো তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরা– এ থেকে বেশী কিছু নয়।

কেউ আধা বেহুঁশ হয়ে পড়লে যেমন তার চোখের ওপর পানির ছিটা দিলে সম্বিৎ ফিরে পায় ঠিক তেমনি ওলামায়ে কেরামের অর্ধঘুমন্ত চিন্তা-চেতনার ওপর সামান্য পানির ছিটা মারার 'বেয়াদবি' করছি মাত্র। আমার দৃষ্টিতে আলেম সমাজ হলেন প্রবহমান স্রোতস্বিনী নদীর মতো, যার গতি কখনো রুদ্ধ হবে না। তাঁরা যেখানেই যাবেন সেখানেই জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হবেন। চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে চারদিকের পরিবেশ আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলবেন। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাঁরা কাংখিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছেন না। অথচ এক সময় তাঁরা প্রবল স্রোতে পৃথিবীময় প্রবাহিত হয়ে দুনিয়ার শুষ্ক মরুপ্রান্তর সিক্ত করে নব সৃষ্টিতে উপকরণ যুগিয়েছেন। সেই প্রবহমান স্রোতস্বিনী সহসা যেনো নিশ্চল নিথর উপত্যকায় এসে গতিরুদ্ধ হয়ে অতি ক্ষুদ্র সরোবরে পরিণত হতে চলেছেন।

মুসলিম উম্মাহ্ যখন চিন্তা, গবেষণা ও নিত্য-নতুন আবিষ্কারের পথ পরিহার করে ভোগ-বিলাসের দিকে মনোযোগী হলো, তখনই পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতা ক্রমশ সারা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে এক সময় তা প্রত্যেকটি জনপদের রান্নাঘর থেকে শাসনদন্ড পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে কর্তৃত্বের আসনে আসীন হলো। ইসলামের স্বর্ণযুগে নেতৃত্ব ছিলো আলেম সমাজেরই হাতে। নেতৃত্বের আসন থেকে তাঁরা ছিটকে পড়ে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন অপরিচিত এক পরিবেশ। এই অপরিচিত পরিবেশের ঘৃণ্য অন্ধকার মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকটি নাগরিককেই কম-বেশী ছেয়ে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যের এই অন্ধকার পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন এবং মুসলিম উম্মাহ্কে অন্ধকার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামকে আঁক্ড়ে ধরার জন্যে করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে থাকলেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্ তাদের কথার প্রতি সামান্যতম কর্ণপাতও করলো না। কারণ দুষিত পানি ততক্ষণে অনেক দূর প্লাবিত করে ফেলেছে।

মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে সবসময় প্রাণবন্ত, গতিশীল, জ্ঞানদীপ্ত ও কর্মচঞ্চল সভ্যতাই অনুসরণ করে থাকে। নিশ্চল, অথর্ব, অনড়, অবিচল, জরাজীর্ণ ও অনগ্রসর সভ্যতার অনুসরণ করে না।

ইসলাম সর্বযুগেই প্রাণচঞ্চল, কর্মমুখর ও জ্ঞানদীপ্ত জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু এই প্রাণ-চঞ্চলতা নির্ভর করে চিন্তা, গবেষণা, নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও মৌলিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যুগোপযোগী নতুন নীতিমালা প্রণয়নের ওপর। এখানেই আলেম সমাজের ছিলো সীমাহীন ব্যর্থতা। পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন প্রভাব বিস্তার করছিলো, তখন তাদের সচেতন ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিলো। মানবতা বিধ্বংসী পাশ্চাত্য সভ্যতার নীতি ও ভিত্তিমূলকে সঠিকভবে উপলব্ধি করা এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহ পরিভ্রমণ করে এর মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ছিলো আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সম্মানিত আলেম সমাজের উচিত ছিলো, প্রভাব বিস্তারকারী ও কার্যকর যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বাস্তব প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে পাশ্চাত্যের অধিবাসীগণ ক্রমশ বৈষয়িক উন্নতি করছে, গবেষণা শক্তি প্রয়োগ করে সেগুলোকে নিজেরা আয়ত্ব করা এবং ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকে মুসলিম উম্মাহ্কে শিক্ষা দেয়া এবং সমাজ ও জাতীয় জীবনে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। যদি এই প্রক্রিয়া অতীতে অবলম্বন করা হতো এবং বর্তমানেও যদি করা হয়, তাহলে কয়েক শতাব্দীর নিষ্ক্রিয়তাজনিত ক্ষতি ইনশাআল্লাহ পূর্ণ হয়ে যাবে। সেই সাথে ইসলামও একটি গতিশীল, প্রাণবন্ত, প্রাণচঞ্চল ও কর্মমুখর সভ্যতা হিসেবে পৃথিবীর মানুষের কাছে পুনরায় নিজের গর্বিত অবয়ব উন্মুক্ত করতে পারবে।

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় মুসলিম-অমুসলিম প্রত্যেক দেশেই পাশ্চাত্যের জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে ওঠা কর্মমুখর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যেকটি শিক্ষাঙ্গনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে ইসলামের প্রেমিকগণ কোরআন হাদীসের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে যে সকল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ সকল মাদ্রাসায় উন্নত নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবন ও কর্মের সাথে এ শিক্ষার কোনো সাদৃশ্য নেই। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল লোকজন শিক্ষিত হয়ে বের হচ্ছেন, তারা জাতিকে নেতৃত্ব দেয়া ও দেশ পরিচালনায় বহুলাংশে অনুপোযোগী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন। আর পাশ্চাত্য শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হচ্ছেন, তারাই জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার ও দেশ পরিচালনার যোগ্য হচ্ছেন বটে, তবে তা সততা ও স্বচ্ছতার দিক থেকে অধিকাংশই শূন্য। এ ক্ষেত্রে বিগত সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফসল ফাযিল-কামিলের ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান বাস্তবায়ন জাতিকে কিছুটা হলেও আশান্বিত করেছে।

অন্য দিকে সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলেম সমাজ ইসলামের প্রকৃত প্রাণচেতনা থেকে দূরে সরে রয়েছেন। তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে, একে তাঁরা চিন্তা-গবেষণায় প্রয়োগ করছেন না। যে বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তি রয়েছে, তা তাঁরা ব্যবহার করছেন না বিধায় বুদ্ধি ও কর্মের ওপরে জড়তা চেপে বসেছে। আল্লাহর নাযিল করা কিতাব ও নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শিক ও বাস্তব হিদায়াত থেকে ইসলামের সনাতন ও প্রাণচঞ্চল গতিশীল নীতিমালা প্রণয়ন করে যুগের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে প্রয়োগ করার কোনো চেষ্টা তাঁরা অনেকেই করছেন না। কেউ করার চেষ্টা করলেও প্রাচীন ধ্যান-ধারণাপন্থী আলেম সমাজ একজোট হয়ে তাদের বিরোধিতা করছেন।

আর ঠিক এ কারণেই বর্তমানে আলেম সমাজের পক্ষে মুসলিম উম্মাহ্‌র সাফল্যজনক নেতৃত্ব দান করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে এমন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে যে, অতীতের গবেষণালব্ধ জ্ঞানগর্ভ কিতাব দ্বারা এই পরিবর্তনকে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল করা কঠিন ব্যাপার। শতাব্দীকালের পুঞ্জিভূত আবরণ ভেদ করে সমাধান বের করে আনা কেবলমাত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব এবং এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন আলেমগণ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বর্তমান সমস্যার সমাধানে নিজেদেরকে কোরআন-হাদীসভিত্তিক গবেষণায় নিয়োজিত করবেন। প্রথমে রোগীর রোগ অনুধাবন করতে হবে, তারপর যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে। অতীতে জ্বর হলে কুইনাইন দেয়া হতো, এখন কুইনাইনের স্থলে এন্টিবায়োটিক স্থান দখল করেছে– এ কথা মনে রাখতে হবে।

আলেম সমাজের প্রাণান্তর প্রচেষ্টা

এ কথা অবশ্যই ধ্রুব সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে যে হিংসাত্মক যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে, আমার মতে তা পারমাণবিক যুদ্ধের চাইতেও মারাত্মক। কারণ আসলে এটি হচ্ছে War of Civilization সভ্যতার যুদ্ধ তথা ইসলামী আদর্শ মূলোৎপাটনের যুদ্ধ। এ কথা সত্য যে, আমাদের আলেম সমাজ পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সূচনালগ্ন থেকেই প্রাণান্তকর যুদ্ধ করে আসছেন। কিন্তু নতুন এই মহাবিপদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ কিছু সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশ আলেম সমাজের কাছে অজানা। মনে রাখতে হবে, ইসলাম সর্বকালে সর্বযুগেই সবথেকে বেশী আধুনিক এবং এই আধুনিকতাকে গ্রহণযোগ্য যুক্তির

মাধ্যমে মানুষের সম্মুখে লেখনী ও নতুন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। একশ্রেণীর আলেমগণ ইসলামের শিক্ষা ও তার বিধি-ব্যবস্থা প্রচার করার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তা আধুনিক শিক্ষিত লোকজনকে ইসলামের সাথে পরিচয় ঘটানোর পরিবর্তে উল্টো বরং তাদের মনে ইসলামের প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করছে। এসব আলেমদের বক্তৃতা ও রচিত গ্রন্থসমূহ কোনো অমুসলিম শুনলে এবং পড়লে ইসলামের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও বোধ করবে না।

মনে রাখতে হবে, মরচে ধরা হাতিয়ার দিয়ে আধুনিক অস্ত্রের মোকাবেলা যেমন করা যাবে না, তেমনি শুধু সেকেলে কল্প-কাহিনী সর্বস্ব ওয়াজ-নসিহত দিয়েও যুগের গতিকে পরিবর্তন করা যাবে না। ইসলামের সর্বাধুনিক রূপ-সৌন্দর্যের ওপর কালের যে আস্তরণ পড়েছে, সে আস্তরণ পরিষ্কার করে ইসলামের প্রকৃত রূপ-সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সম্মুখে বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। এ জন্যে নিজেদেরকে চিন্তা-গবেষণায় নিয়োজিত করতে হবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বুনিয়াদ ও এর দুর্বলতাসমূহ জানতে হবে। অর্জন করতে হবে যুক্তিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, ভাষাশক্তি, শব্দ চয়নশক্তি, প্রয়োগ পদ্ধতি এবং অনুধাবন করতে হবে যথাযথ ক্ষেত্র।

মহান আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করছি এ জন্যে যে, পরিবেশ প্রভাবের মোকাবেলা ও স্থান-কালের পরিবর্তন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার লক্ষ্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম উম্মাহ্কে দু'টি অতুলনীয় নিয়ামত দান করে ধন্য করেছেন। এর একটি হলো, নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ তথা সীরাত মোবারক– যা প্রত্যেকটি দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটে এবং প্রতিটি পরিবর্তনকে অত্যন্ত সহজভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম। তাঁর মহান শিক্ষার মধ্যে প্রত্যেক যুগের সমস্যা সমাধানের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা বিদ্যমান।

আর দ্বিতীয়টি হলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং ইসলামের জীবন্ত আদর্শকে উজ্জীবিত করার জন্যে প্রত্যেক শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ্র জন্যে এমন সকল সংস্কারক পাঠাচ্ছেন– যা পূর্ববর্তীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান-ভান্ডার পরবর্তীদের জন্যে স্থানান্তর হচ্ছে এবং নিত্য-নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে ইসলামের নীতিসমূহ যুগোপযোগী করে উম্মাহ্র সম্মুখে যৌক্তিক বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করছেন। আর এভাবেই সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র মুসলিম উম্মাহ্ই ইসলামী আদর্শকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে 'সন্তান-প্রসবিনী' হিসেবে ইতিহাসে

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা অন্য কোনো সম্প্রদায় বা আদর্শের অনুসারীগণ করতে পারেনি। ফলে অন্যান্য আদর্শগুলো যেখানে মৌলিকত্ব হারিয়ে পৃথিবীতে বিকৃত অবস্থায় অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। সেক্ষেত্রে ইসলামই একমাত্র বিশ্ব জুড়ে অগ্রসরমান জীবন্ত আদর্শ হিসেবে আজো স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আলেম সমাজকে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক যুগেই ঈমানদারগণ জ্ঞানের দিক থেকে পরিপক্ক অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন, অন্য দিকে লাত ও মানাত যেমন যুবক তেমনি তার অনুসারীগণও ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বুদ্ধিতে অপরিপক্ক যুবকই রয়ে গেছে। অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত শক্তি প্রত্যেক যুগেই নতুন অবয়বে যুবক-রূপে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু শয়তানী বুদ্ধিতে পরিপক্ক যুবক লাত-মানাত কোনো যুগেই জ্ঞান-বৃদ্ধ ঈমানদারদের ওপর বিজয়ী হতে পারেনি, আগামীতেও পারবে না ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখতে হবে, অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ্ সবথেকে বেশী ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী। মুসলিম উম্মাহ্ বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই উম্মাহ্র কল্যাণে কোনো পদক্ষেপই বাধামুক্ত হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে প্রতিকুল পরিবেশ মোকাবেলা করার জন্যে মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, নবী-রাসূলগণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং তৎপরবর্তী যুগের চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ কেউ-ই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পথ পরিহার করে অনিয়মতান্ত্রিক পথে সামান্যতমও অগ্রসর হননি।

বর্তমানে অনেকেই অবচেতনভাবেই দুশমন কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে অনিয়মতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করে মুসলিম উম্মাহ্র অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ প্রচেষ্টার কর্মকান্ডে কারো মধ্যে যদি সামান্য অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাসের গন্ধ পাওয়া যায়, তাহলে স্পষ্ট বুঝতে হবে– এরা ইসলামের দুশমনদের দ্বারা পরিচালিত এবং এদেরকে ধরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে সোপর্দ করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় আমাদের দেশে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার নামে আব্দুর রহমান এবং বাংলাভাই জেএমবি গঠন করে ইসলামের যে ক্ষতি সাধন করেছে, বিগত এক'শ বছরেও ইয়াহূদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের এত বড় ক্ষতি করতে পারেনি। ইসলামে ষড়যন্ত্র, উগ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই। এসব বিভ্রান্ত লোকজনের অপতৎপরতা ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বহু পিছিয়ে দিয়েছে।

আবার কে বা কারা রাজধানী ঢাকাসহ মফস্বল শহরের দেয়ালগুলো দখল করে তাতে লিখছে, **'ইসলামের নামে নির্বাচন হারাম, ভোট হারাম'**। এ জাহিলদের জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন ভোট-নির্বাচন হারাম হলে সরকার পরিবর্তনের উপায় কি? মূলতঃ এ নির্বোধেরা এসব শ্লোগানের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকেই উস্‌কে দিচ্ছে।

তাই কোরআন-সুন্নাহর আলোকে দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে ঠান্ডা মাথায় একশ' বছর অপেক্ষা করতে হবে; তবুও কোনো অবস্থায়ই উগ্রপন্থা তথা সন্ত্রাসী তৎপরতাকে বিন্দুমাত্র সমর্থন দেয়া যাবে না।

ইসলাম সম্পর্কে কল্পিত ভীতি দূর করুন

সম্মানিত আলেম সমাজ! পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যত সম্পদ দান করেছেন, তার অধিকাংশ সম্পদই মুসলিম ভূ-খন্ডে রয়েছে। তৈল ও গ্যাস সম্পদসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের অধিকাংই রয়েছে মুসলিম ভূ-খন্ডে। বিপুল সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য থাকার পরও এ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্‌ বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যম গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে ইসলামের দুশমনগণ শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমে সারা দুনিয়াব্যাপী মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরণের মিথ্যা প্রচার করে মানুষের মনে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে এক ধরণের কল্পিত আতঙ্ক (Panic) সৃষ্টি করেছে। ইসলাম মানেই সন্ত্রাসবাদ আর মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী– এই ধারণা তারা পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করছে।

আমরা যে দেশে এবং এলাকায় বাস করি, সে দেশে ও এলাকায় অবশ্যই অমুসলিম নাগরিক রয়েছেন। আলেম সমাজ প্রত্যেক ধর্মের পাদ্রী ও পুরোহিত এবং বিশিষ্ট লোকদের দাওয়াত দিয়ে গোল টেবিলে আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। নিজেরা কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে টিভি চ্যানেল এক ঘন্টার জন্য ভাড়া নিয়ে সেখানেও উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। অমুসলিম নেতৃবৃন্দকে মুক্ত মনে ইসলাম এবং মুসলমানদের ব্যাপারে প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়ে উদ্ভূত প্রশ্নের যুক্তি সম্মত জবাব দিয়ে তাদের মন থেকে ইসলাম সম্পর্কিত সংশয়-সন্দেহ দূর করার ব্যবস্থা করতে পারেন।

ইসলামে জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসবাদের গন্ধও নেই এবং মুসলমানরাই যে পৃথিবীতে সবথেকে সহনশীল, ধৈর্যশীল, পরোপকারী, অন্যের কল্যাণকামী, শান্তিকামী, সত্যবাদী, ইনসাফকারী, আমানতদার এবং পরধর্ম সহিষ্ণু জাতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ গোল টেবিল আলোচনায় কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে ধরতে হবে।

মুসলিম শাসকদের স্বর্ণালী শাসন সম্পর্কে জানাতে হবে। তাহলে সাধারণ অমুসলিমদের কাছে প্রচার মাধ্যমের মিথ্যা প্রচারণা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাঁরা মুসলমানদের কাছাকাছি আসবেন এবং ইসলামকে জানার চেষ্টা করবেন।

আমি অনেক অমুসলিমদের সাথে কথা বলে অনুভব করেছি, ইসলামে বহু বিবাহ, তালাক ব্যবস্থা, নারীর অধিকার এবং পর্দা প্রথার ব্যাপারে সঠিক তত্ব না জানার কারণে তারা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক তত্ব জানাতে হবে। নিজ স্ত্রীকে রেখে অন্যের স্ত্রী ও পর নারীদের নিয়ে ক্লাবে-হোটেলে ফুর্তি করতে যাওয়া উত্তম- না প্রয়োজনে একের অধিক বিয়ে করা উত্তম? পর নারীর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা পাশ্চাত্যের জনগণও অনুচিত বলে মনে করে, তা আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের সাথে মনিকার সম্পর্কের বিষয়টিই বড় প্রমাণ। তাদের ধর্মে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকলে ক্লিন্টন-মনিকার বিষয়টি দুনিয়া জুড়ে নিন্দিত হতো না।

ইসলাম একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য করা দূরে থাক- বরং নিরুৎসাহিত করেছে। পরিস্থিতি বাধ্য করলে এবং কারো একান্ত প্রয়োজন হলে পর নারীর দিকে হাত না বাড়িয়ে বা জেনা-ব্যভিচারের মতো ঘৃণ্য পথে না গিয়ে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ নানা স্বভাব-প্রকৃতির হয়ে থাকে। কারো মন-মানসিকতা হয় কোমল প্রকৃতির আবার কারো তা কঠোর প্রকৃতির। দাম্পত্য বা পারিবারিক জীবনে স্ত্রী বা স্বামী ক্ষেত্র বিশেষে কেউ একজন কঠোর প্রকৃতির হতে পারে। কারো শারীরিক অক্ষমতাও থাকতে পারে বা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবার পরেও রোগের কারণে শারীরিক অক্ষমতা দেখা দিতে পারে। আবার উভয়ের কেউ একজন স্বভাবের দিক দিয়ে অবাধ্য, ইসলামী শরীয়াত লংঘনকারী, চরিত্রহীন, অত্যাচারী ও নির্যাতকও হতে পারে। এ অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্যেই ইসলামে তালাক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তবে এ বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে ইসলাম এই বিষয়টি মানব সম্প্রদায়ের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, হালাল কাজের মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে আকাশের নীচে ও যমীনের বুকে তালাক এবং ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই। শেষ পর্যায় পর্যন্ত তালাকের বিষয়টি এড়িয়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধানের

নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা সমাধানের যখন সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন বঞ্চিতজনের অধিকার প্রদান এবং নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যেই তালাক গ্রহণের বিষয়টি সম্মুখে আনা হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কারো একজনের শারীরিক অক্ষমতা মেনে নিয়ে কেউ যদি দাম্পত্য জীবনের বন্ধন অটুট রাখতে চায়, এ ব্যাপারেও যেমন ইসলাম উৎসাহিত করেছে, তেমিন বন্ধন ছিন্ন করারও সুযোগ রেখেছে। দাম্পত্য জীবনে নির্যাতকের প্রতি ইসলাম যেমন নিন্দার তীর ছুড়ে পরকালীন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছে, তেমনি নির্যাতকের কবল থেকে মুক্তি লাভের স্বাধীনতাও দিয়েছে।

হিন্দু এবং খৃষ্টধর্মে তালাক ব্যবস্থা নেই। স্বামী-স্ত্রীর কেউ একজন শারীরিকভাবে অক্ষম হলে বা উভয়ের কেউ একজন নির্যাতক হলেও এই করুণ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের কোনো ব্যবস্থা এসব ধর্মে রাখা হয়নি।

বিধবা বিবাহ ধর্মীয়ভাবে হিন্দুদের মধ্যে নিষিদ্ধ। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আন্দোলন করে সতীদাহ প্রথা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ও বিধবা বিবাহ বৈধ করেছেন। খুবই মানবতাবাদী কাজ করেছেন তাঁরা। স্বামী মারা গেলে বিধবাগণ বিয়ে করতে পারবে না বিধায় তাদেরকে জীবত অবস্থায় মৃত স্বামীর চিতায় উঠিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হবে, এই প্রথাটি ছিলো খুবই নিষ্ঠুর প্রথা। একজন বিধবা নারীও তো মানুষ এবং মানুষের মৌলিক সকল চাহিদা তার মধ্যে রয়েছে। একজন নারীর মৌলিক চাহিদাকে নিষ্ঠুরভাবে গলা টিপে হত্যা করার মতো জঘন্য কাজ আর কিছুই নেই। সক্ষম পুরুষের যেমন নারী সঙ্গ প্রয়োজন, তেমনি সক্ষম সুস্থ নারীরও পুরুষ সঙ্গ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন অস্বীকার করে নারীকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করা নিতান্তই অমানবিক কাজ।

নারী সম্পর্কে অমুসলিমদের জানাতে হবে, ইসলাম পুরুষের তুলনায় নারীকে তিনগুণ বেশী মর্যাদা দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো কোনো ধর্ম নারীকে 'মানুষ' হিসেবে গণ্য করে না এবং তাদের কোনো অধিকারও স্বীকার করে না। পিতৃ বা স্বামী-সন্তানের ধন-সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার নেই। ইসলাম এই অধিকার দিয়ে সম্মান-মর্যাদার উচ্চ আসনে আসীন করেছে। নারীর জন্যে পৃথক কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করে উপার্জনের অধিকার দিয়েছে। শিক্ষা গ্রহণ করা বা জ্ঞান অর্জন শুধুমাত্র পুরুষের প্রতি ইসলাম ফরজ করেনি, নারীর প্রতিও ফরজ করেছে। নারী যদি জ্ঞানী,

রুচিবান, ভদ্র, নম্র, বিনয়ী, সহিষ্ণু ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত না হয়, তাহলে সে সন্তানকে উত্তম গুণাবলী শিক্ষা দিবে কিভাবে? বলাবাহুল্য শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত উত্তম গুণাবলী শেখা যায় না।

লোহা এবং স্বর্ণ দুটোই ধাতু। একটি ধাতু সংরক্ষণে প্রহরা বা যত্নের প্রয়োজন হয় না। বড় বড় ইমারত নির্মাণের জন্যে বা অন্যান্য কাজে প্রচুর লোহা প্রয়োজন হয়। এসব লোহা ক্রয় করে আলমারী বা সিন্দুকে অথবা ব্যাংকের লকারে কেউ রাখে না। কিন্তু স্বর্ণের পরিমাণ কম বেশী যাই-ই হোক না কেনো, তা সিন্দুকে বা আলমারীতে রেখে তালাচাবি দিয়ে রাখা হয়। পরিমাণে বেশী হলে ব্যাংকের লকারে রাখা হয়। এ জন্যেই রাখা হয় যে, স্বর্ণ মূল্যবান ধাতু। অযত্নে অবহেলায় রাখলে তা চুরি হয়ে যাবে।

তেমনি নারীও পুরুষের তুলনায় সৃষ্টিগতভাবে মর্যাদাসম্পন্ন ও মূল্যবান। মানব বংশ বৃদ্ধিকরণে এবং সন্তান-সন্ততি লালন-পালনে পুরুষের তুলনায় নারীর অবদান বেশী। পুরুষের কাছে নারীকে আকর্ষণীয়ভাবে সৃষ্টি করে নারীকে পুরুষের জন্যে অনুপ্রেরণা দায়িনী বানানো হয়েছে। একজন পুরুষ যখন জীবন সঙ্গিনী হিসেবে একজন নারীকে বিয়ে করে, তখন সে পুরুষ অবচেতনভাবেই সংসার সাজানোর কাজে একমাত্র নারীর জন্যেই অনুপ্রাণিত হয়। পৃথিবীর সকল কঠিন কাজের দায়ভার থেকে নারীকে মুক্তি দিয়েছে ইসলাম। নারী ও পুরুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সৃষ্টিগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আকর্ষণই পারিবারিক জীবনের দৃঢ় বন্ধনের মূল ভিত্তি।

নারী ও পুরুষের পরস্পরিক অবাধ মেলামেশা পারিবারিক জীবনের মূল ভিত্তিকে বিনষ্ট করে জীবনকে বিষিয়ে তোলে এবং পরিশেষে পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। পারিবারিক অশান্তি মানসিক অশান্তির কারণ এবং এই অশান্তিই স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে আত্মহননের পথে এগিয়ে দেয়। পরিবারে শান্তি না থাকলে সন্তান-সন্ততিও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এর বাস্তব প্রমাণ বহন করছে বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকার দেশসমূহ। সেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে পারিবারিক বন্ধন বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। মুসলিম দেশসমূহেও যেসব পরিবারে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা রয়েছে, সেসব পরিবারে তালাকের আধিক্য দেখা দিয়েছে।

পবিত্র কোরআন-হাদীসে অমুসলিমদের উপাস্য দেব-দেবী সম্পর্কে কটূক্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাদের ধর্মীয় ও অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, তাদের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, এ সকল বিষয় অমুসলিমদের সাথে গোল টেবিল আলোচনায় আমাদের আলেম সমাজ তুলে ধরতে পারেন। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্যে প্রচুর পড়াশোনা ও গবেষণা করা প্রয়োজন।

আজকের এ লেখায় আমি এ কথা স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা ব্যতীরেকে বিশ্বে শান্তি রক্ষা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সার্বজনীন ইসলামের ধারে কাছে যাতে মানুষ না আসতে পারে, তজ্জন্য ইসলাম বিদ্বেষীরা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গোল-টেবিল বৈঠক, কবিতা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা, এনজিও, পত্র-পত্রিকা, যাত্রা-থিয়েটার, টিভি চ্যানেলসহ বহুবিধ মাধ্যম অবলম্বন করেছে।

সমাজকে ধর্মচ্যুত অর্থাৎ ইসলাম থেকে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সবাইকে বের করে আনার জন্য রাতদিন পরিশ্রম করছে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে, সময় ব্যয় করছে এবং সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। এরা ইসলাম পন্থীদের বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমগুলোয় নির্লজ্জ মিথ্যাচার করেই যাচ্ছে। লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে একই ভাঙ্গা রেকর্ড 'হিজ মাস্টার ভয়েজ' জাতিকে শোনাচ্ছে। প্রয়োজনে জেল জরিমানারও ঝুঁকি নিচ্ছে। গোটা মস্তিষ্ক জুড়ে তাদের চিন্তা-চেতনা 'যেভাবেই হোক রাষ্ট্রকে ইসলাম মুক্ত করো, যতো প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে ইসলাম আছে, যতো সংগঠন ইসলামপন্থী আর দেশ বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব যাঁরা রয়েছেন, তাদের বদনাম করো, তাদেরকে জনসম্মুখে হেয়-প্রতিপন্ন ও নিন্দনীয় করো'।

মজার ব্যাপার হলো, এসব ঘৃণিত কাজ কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান করছে না, বিপুল অর্থের বিনিময়ে এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে নামানো হয়েছে মুসলিম নামধারী অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক, কবি-সাহিত্যিক, কলামিষ্ট, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ এমনকি পরিচিত আলেম বা পীরের সন্তানদেরকেও। ইসলাম বিদায় হোক, মুসলমান ঈমান হারাক, দেশ ধ্বংস হোক, মুসলিম যুবক-যুবতী জাহান্নামে যাক– এতে এদের কিছুই আসে যায় না। এদের লালসার দৃষ্টি শুধু অর্থের দিকে।

পৃথিবীতে কোনো ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় সম্মানিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এত লেখালেখি এবং এতটা বিষোদ্গার করে না– যতটা আলোচনা সমালোচনা ও বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যা লেখালেখি করে আমাদের দেশের মুসলমান নামধারী কুলাঙ্গারেরা ইসলাম, ইসলামী সংগঠন ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে।

এসব ব্যাপারে দেশের ওলামা সমাজকে আরো সচেতন হতে হবে। ইসলামের ছদ্মাবরণে অথবা প্রকাশ্যে কারা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা করছে; আর ইসলামের জন্য কারা নিবেদিত, কারা সততা-স্বচ্ছতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাদেরকে চিনতে হবে, জানতে হবে এবং ঈমানী জযবা নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হতে হবে। দেশ এখন **'নো-রিটার্ণ পয়েন্ট'**-এ অবস্থান করছে। হয় ফুলের বাগান না হয় গোরস্থান। আপনি কোনটি চান? সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই সময়।

সম্মানিত ওলামা সমাজ! আপনারা দেশটিকে দুর্নীতি মুক্ত পরিবেশে শান্তি, স্বস্থি, উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে চান– এটাই আমার বিশ্বাস। এ জন্যে যা যা করণীয় তা হচ্ছেঃ–

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

➡ 'তোমরা (শুধু) নেক কাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারেই একে অপরের সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে (কখনো) একে অপরের সহযোগিতা করো না'। (সূরা মায়িদা– ২)

এই আয়াতের মর্মানুযায়ী সরকার কর্তৃক গৃহীত সৎ কাজ ও সৎকর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে যতটা সম্ভব জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করা এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা উচিত। যেমন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান– এ কাজে প্রত্যেকেরই উচিত যার যার অবস্থানে থেকে দুর্নীতি ও চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা।

জ্ঞানের পরিধি পড়া-শোনার মাধ্যমে আরো শানিত করতে হবে, বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে এবং বুদ্ধি দীপ্ত চোখ-কান খোলা রেখে ইসলামের বন্ধু ও দুশমন চিনতে হবে।

ইসলাম মৌলবাদ নয়, সাম্প্রদায়িক নয়, জঙ্গীবাদ নয়, উগ্রপন্থী নয়– বরং ইসলাম জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দল-মত সকলের কাছে গ্রহণ যোগ্য সার্বজনীন জীবনাদর্শ এ কথা বিজ্ঞান সম্মত যুক্তির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষিতদের বোঝাতে হবে।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেকুলারপন্থী, পাশ্চাত্যপন্থী, শাসকশ্রেণী, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ এসব এলিট শ্রেণীর সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপে অংশ নিতে হবে এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তি নারী। পৃথিবীর কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ নারীকে অতটা মর্যাদা দেয়নি– জীবনের সকল ক্ষেত্রে যতটা মর্যাদা ও অধিকার ইসলাম নারীদেরকে দিয়েছে, বিষয়গুলো নারীদের জানাতে হবে। পর্দার বিষয়টিও তাদেরকে ব্যাখ্যা সহকারে বোঝাতে হবে। পর্দা প্রগতির অন্তরায় নয়– এটা নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় আল্লাহ প্রদত্ত হাতিয়ার। বোরকা, হিজাব, নিকাব নারীর পবিত্র সৌন্দর্য বর্দ্ধক ফ্যাশনও বটে। এ বিষয়গুলো নারীদেরকে বোঝাতে হবে এবং পর্দা সহকারে মসজিদ- ঈদগাহে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের সম্মানজনক অধিকার দিতে হবে। মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ওলামা সমাজের দায়িত্ব সর্বাধিক।

জীবন পরিচালনায় ইসলাম যেখানে যতটা সহজ নীতি অবলম্বন করেছে ইজতিহাদের নামে তা কঠিন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর আদৌ পসন্দনীয় নয়। এ বিষয়ে কোরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াত লক্ষ্য করুনঃ–

➡ 'আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের (জীবন) সহজ করে দিতে চান তিনি তোমাদের (জীবন) জটিল করতে চান না'। (সূরা বাকারা-১৮৫)

➡ 'আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান (কারণ) মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে'। (সূরা নিসা-২৮)

➡ 'আল্লাহ তা'য়ালা কখনো তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না'। (সূরা মায়িদা-৬)

➡ 'এটা তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সহজকরণ (যা তোমাদের জন্য তাঁর) বিশেষ অনুগ্রহ'। (সূরা বাকারা-১৭৮)

➡ 'আল্লাহ তা'য়ালা কখনো কাউকে তার শক্তি- সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।' (সূরা বাকারা-২৮৬)

➡ যে কোনো ইমারতের দীর্ঘ স্থায়ীত্ব নির্ভর করে তার ফাউন্ডেশনের মজবুতির ওপরে, ঠিক তেমনি মুসলিম জাতির মর্যাদার সাথে টিকে থাকা এবং দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্য নির্ভর করে তার তাওহীদ ভিত্তিক নির্ভেজাল ঈমানের ওপরে। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ওলামা সমাজকে তাওহীদ, শিরক্ ও বিদয়াত সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো ব্যাপক অধ্যয়ন করতে হবে এবং জাতিকে সতর্ক করতে হবে।

➡ হযরত উমার ফারুক (রাঃ) বলেছেন, 'জামায়াত বদ্ধ জীবন ছাড়া ইসলাম চলে না (স্থবিরতা এসে যায়)।' সুতরাং ইসলামের গতিশীলতার জন্য এবং নিজের অর্জিত ইল্‌ম ও আল্লাহ্ প্রদত্ত মেধা, প্রজ্ঞার উত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে শরীক করতে হবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করার এবং তদানুযায়ী বাস্তব সম্মত সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন– ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আপনার মধ্যে নবীর চরিত্র দেখছি

২৯শে মার্চ সাউদী সরকারের Ministry of Islamic Affairs & Endowment & Call & Guidance -এর রিয়াদের পরিচালক **শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাবীব আল খাল্লাকী**-এর আমন্ত্রণে তার কার্যালয়ে গেলাম। মুহ্‌তারাম শায়খ খাল্লাকী বর্তমান যুগের বড় আলেমদের মধ্যে একজন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত আধুনিক, বিজ্ঞান-মনস্ক ও উদার পন্থা অনুসরণ করেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর সার্বিক কর্মপদ্ধতি দেখে আমার মনে হলো, ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ–

প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রব-এর পথের দিকে আহ্বান করো এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। (সূরা নাহ্‌ল-১২৫)

এই আয়াতের প্রত্যেকটি দিক তিনি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যের সবথেকে বড় শহর হবার কারণে রিয়াদ নগরীতে সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশেরই কম-বেশী লোকজন এখানে রয়েছে। শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাবীব আল খাল্লাকী সকলের কাছেই তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। বিশাল এলাকা জুড়ে তিনি প্রচার কেন্দ্র নির্মাণ করেছেন। এখানে অত্যাধুনিক খেলার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে বৈধভাবে চিত্ত বিনোদনের নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সাথে রয়েছে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইসলামী গ্রন্থসমূহ। সঙ্কীর্ণতা মানুষকে ইসলাম

থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং উদারতাই মানুষকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করে। মুহ্তারাম খাল্লাকী ঔদার্য্য দিয়েই মানুষকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করছেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মাদকাসক্ত এক সাউদী যুবকের কথা বললেন। নামাজ-রোজার সাথে উক্ত যুবকের কোনো সম্পর্ক ছিলো না এবং এলাকার মধ্যে সে সবথেকে 'খারাপ ও বদমেযাজী' হিসেবে পরিচিত ছিলো। নবী করীম (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার জন্যে তিনজন প্রচারক যখন দাওয়াত নিয়ে উক্ত যুবকের কাছে যাচ্ছিলেন, তখন এলাকার অনেকেই উক্ত যুবকের 'সন্ত্রাসী প্রকৃতি' সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। প্রচারক তিনজন সবকিছু উপেক্ষা করে সে যুবকের বাড়ির দরজায় গিয়ে আওয়াজ দিলো, যুবক দরজা খুলে দিয়ে প্রচারক তিনজনের দিকে বিরক্তিভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জানতে চেয়েছিলো, কোন্ উদ্দেশ্যে তাঁরা এখানে এসেছেন।

প্রচারক তিনজন জানিয়েছিলেন, তাঁরা পানি পান করতে চান। সে যুবক তাদেরকে বসতে দিয়ে খেজুর এবং পানি এনে দিলে তাঁরা খেজুর খেয়ে পানি পান করার পরে যুবকের দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা আপনার মধ্যে নবী করীম (সাঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি।' যুবক অবাক বিস্ময়ে প্রচারক তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, 'আমার মধ্যে আপনারা নবী করীম (সাঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছেন! অথচ এলাকার সকল মানুষ আমাকে খারাপ বলে!'

প্রচারকদের মধ্য থেকে একজন বললেন, 'আপনার সম্পর্কে কে কি মন্তব্য করে, সেটা মূখ্য বিষয় নয়, রাসূল (সাঃ)-এর অগণিত বৈশিষ্ট্যের একটি বৈশিষ্ট্য তো এই মাত্র আপনার মধ্যে আমরা দেখলাম। তিনি মেহমানদের কখনো কিছু খেতে না দিয়ে বিদায় করতেন না। আপনিও তো তা-ই করলেন। আমরা পানি চাইলাম আর আপনি আমাদেরকে খেজুর খেতে দিলেন। এটা নবী করীম (সাঃ)-এর গুণাবলী।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে সে যুবক কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলো এবং সে নিজের জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে নিজেকে কোরআন-হাদীসের অনুগত করে দিয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে মুহ্তারাম খাল্লাকী বললেন, তিনটি গুণের সমন্বয় সাধন করতে পারলে এখনও সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ না হলেও তাঁদের কাছাকাছি গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জামায়াত এখনও গড়া সম্ভব।

বলা বাহুল্য আলোচনা আরবী ভাষাতেই হচ্ছিলো। তিনি এ কথা বলার সাথে সাথে আমি তাঁর দিকে গভীর আগ্রহে তাকালাম। তিনি আপন মনেই বলে গেলেন, জামায়াতে ইসলামী এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীন সাংগঠনিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক অনুসৃত যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে, তা অত্যন্ত ফলপ্রসু। ফলে সংগঠনের প্রত্যেক নেতা-কর্মী প্রশ্নাতীতভাবে সংগঠনের আনুগত্য করে নিজকে সৎ ও যোগ্য করে তোলে। মানুষকে নামাজ-রোজার প্রতি মনোযোগী করতে তাবলিগ জামায়াত দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে যে বিনয়ের পরিচয় দিয়ে থাকে, সে বিনয় তাদের জন্যে সফলতা বয়ে আনে।

মহান আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন বান্দার আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও কর্ম সম্পূর্ণ শির্‌ক-বিদআত মুক্ত থাকে। আকাশের নীচে যমীনের বুকে মানুষদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের পরে সাল্‌ফে সালেহীন-এর আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও সকল কর্ম সম্পূর্ণ শির্‌ক এবং বিদআত মুক্ত ছিলো।

(১) জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের অনুরূপ সাংগঠনিক মজবুতি।

(২) দাওয়াতী কাজে তাবলীগ জামায়াতের বিনয়।

(৩) সাল্‌ফে সালেহীন-এর অনুরূপ বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস ও কর্ম।

মানুষের মধ্যে এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারলে এবং এসব মানুষদের দিয়ে যদি একটি জামায়াত গঠন করা যায়, তাহলে সেই জামায়াত সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হলেও তাঁদের কিছু সংখ্যক গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি জামায়াত এখনো গঠন করা যায়। শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাবীব আল খাল্লাকীর এই কথাগুলো আমার চিন্তার জগতে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেলো।

মুহ্‌তারাম খাল্লাকীকে কেউ একজন আমার সম্পর্কে ভুল বুঝিয়ে ছিলো যে, আমি নাকি ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের বিপরীত পথ অনুসরণ করি এবং আমার বক্তৃতায় আমি ভ্রান্ত পথ অনুসরণের জন্যে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে থাকি। জ্ঞানী লোকদের এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তাঁরা শোনা কথায় কান দেন না। অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্য জানার চেষ্টা করেন। মুহ্‌তারাম খাল্লাকীও সেই পথই অনুসরণ

করলেন। তিনি আমাকে জানালেন, আমার তাফসীর মাহফিলের বিগত ত্রিশ বছরের ক্যাসেট তিনি সংগ্রহ করেছেন এবং সকল ক্যাসেট তিনি দোভাষীর মাধ্যমে শুনেছেন।

আমার সম্পর্কে যিনি তাঁকে ভুল বুঝিয়েছিলেন, আমার বক্তৃতা শুনে তিনি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে তৎক্ষণাত ঐ মিথ্যুক ব্যক্তিকে সাউদী আরব থেকে বহিষ্কার করার ব্যবস্থা করেছেন। লোকটিকে বহিষ্কার করা হয়েছে শুনে আমার খারাপ লাগলো। মুহ্তারাম খাল্লাকী আমাকে অনুরোধ করলেন, আগামী কাল তিনি পঁচিশ হাজার লোকের সমাবেশের ব্যবস্থা করবেন এবং সে সমাবেশে আমাকে বক্তব্য রাখতে হবে। তিনি পঁচিশ হাজার লোকের খাবারেরও ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমি তাঁকে সময় দিতে পারলাম না। আমি বিনয়ের সাথে তাঁকে জানালাম, আজ রাতেই আমাকে নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা পুনরায় যখন আমাকে রিয়াদে আসার সুযোগ দিবেন, তখন আপনার আয়োজিত মাহফিল দিয়েই আমার কার্যক্রম শুরু করবো ইনশাআল্লাহ।

আজ থেকে তিনি আব্দুল্লাহ

রিয়াদ নগরীর একটি সুবিখ্যাত মসজিদের নাম **'মসজিদে আবু হুরাইরা (রাঃ)'**। **২৯শে মার্চ এই মসজিদেই** ইশার নামাজ আদায় করলাম। কর্তৃপক্ষ এই মসজিদে ইশার নামাজ পরে মাহফিলের আয়োজন করেছিলেন। মসজিদের মুসল্লী ধারণ ক্ষমতা পাঁচ সহস্রাধিক। নামাজ আদায় করে উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে কোরআন-হাদীস থেকে ঈমান-আকীদা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মসজিদে তাঁর এত অধিক সংখ্যক বান্দাদের জুটিয়ে দিয়েছিলেন যে, মসজিদে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেকেই মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনছিলেন। অমুসলিমদের মধ্যে অনেকেই আলোচনা শোনার জন্যে এসেছিলেন।

আলোচনা দ্রুতই শেষ করতে হলো, কারণ আর কিছুক্ষণ পরেই আমাকে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্যে রিয়াদ এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে। আলোচনা শেষ করতেই একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতীয় নাগরিক আগ্রহভরে এগিয়ে এলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে। উপস্থিত জনমন্ডলীর সম্মুখেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম রাখা হলো **'আব্দুল্লাহ্'**। এ নামের অর্থ 'আল্লাহর দাস'। নবী করীম (সাঃ) এই নামটি সবথেকে বেশী পসন্দ করতেন।

ক্ষণিক পূর্বেও তিনি ছিলেন নানা ধরণের মূর্তির গোলাম। ইসলামের আলো তাঁর হৃদয়ে প্রবেশের সাথে সাথে তিনি হয়ে গেলেন সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, যিনি এক ও একক, অদ্বিতীয়, অংশীদারহীন এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গোলাম। আঁজ থেকে তাঁর জীবনধারা সম্পূর্ণ বদলে গেলো। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর এই বান্দার জন্যে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলা সহজ করে দিন।

একমাত্র ঈমানই আমাদের অদৃশ্য বন্ধন

মসজিদে আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর **ইমাম শায়েখ যা'দ বিন আহ্‌মাদ সালেহ্ আল মাস্‌রী** খুবই সুশিক্ষিত এবং বিজ্ঞ আলেম। বাংলাদেশের নাগরিকদের হৃদয়ের গহীনে কোরআনের প্রেম কিভাবে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তিনি শুধু কানে শুনেছিলেন এবং ভিসিডির মাধ্যমে হয়ত সে দৃশ্য দেখেও থাকবেন। কিন্তু আজ সে জীবন্ত দৃশ্য তিনি স্বয়ং চোখে দেখলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, আলোচনা চলাকালে তিনি অবাক বিস্ময়ে সমবেত বাংলাদেশী শ্রোতাদের একবার দেখছেন আরেকবার আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। তাঁর সে দৃষ্টিতে বাংলাদেশীদের জন্যে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা যেনো ঝরে পড়ছিলো।

আলোচনা শেষ করতেই উপস্থিত দেশী-বিদেশী নাগরিকগণ যখন মুসাফাহ্ করার জন্যে আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছিলো, তখন মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেব দ্রুত আমাকে উঁচু মিম্বারে নিয়ে এসে বললেন, **'আপনি এখান থেকে সকলকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিন। কারণ উপস্থিত সকলের সাথে মুসাফাহ্ করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে'**।

এরপর মসজিদের **ইমাম শায়েখ যা'দ বিন আহ্‌মাদ সালেহ আল মাস্‌রী** আমাকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আমার আত্মীয়ও নন, আমরা এক দেশের নাগরিকও নই, তাঁর সাথে আমার পূর্ব পরিচয়ও ছিলো না, তবুও তাঁর জড়িয়ে ধরার মধ্যে কি যে মমতা ছিলো, তা ভাষায় ব্যক্ত করতো পারবো না। আমিও তাঁর জন্যে হৃদয়ে গভীর আকর্ষণ অনুভব করলাম।

কিন্তু এর কারণ কি!

এর কারণ হলো আমরা একমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করি, যিনি এক, একক, অদ্বিতীয়, অভাবশূন্য ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। সেই নবীকেই আমরা

একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে অনুসরণ করি, যাঁকে মানবতার মহান মুক্তির দুত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। সেই অভ্রান্ত কোরআনকে আমরা নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যে কোরআনই কেবলমাত্র সারা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আমরা ভিন্ন দেশের নাগরিক হলেও এগুলোই আমাদেরকে মমতার অবিচ্ছেদ্য ও অমোচনীয় বন্ধনের রজ্জুতে বেঁধে একই কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মমতার সে রজ্জু চোখে দেখা যায় না, অদৃশ্য রজ্জু। সূর্যের সাথে পৃথিবীর যে বন্ধন রজ্জু রয়েছে, তা দেখা না গেলেও অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই।

একজন ঈমানদার অপরিচিত আরেকজন ঈমানদারের জন্যে এমনই আকর্ষণ অনুভব করে। যদিও তাঁরা পরস্পরে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস করে। সম্মানিত ইমাম সাহেব নিজের হাতের মূল্যবান ঘড়ি খুলে আমার হাতে পরিয়ে দিলেন। একটি নতুন 'আবা' আমাকে হাদিয়া দিলেন। তাঁর অকৃত্রিম মহব্বতে পরম মমতায় আমার চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

আহা! এক মুসলমানের জন্যে আরেক মুসলমানের এই মমতা! এই গভীর মমতা যদি মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর হৃদয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করতো! তাহলে অমুসলিম শাসকগণ মুসলমানদেরকে প্রতিদিন পাখির মতো গুলী করে হত্যা করার সাহস পেতো না। ঈমানের উপস্থিতিই এক মুসলমানের জন্যে আরেক মুসলমানের মনে গভীর মমতা সৃষ্টি করে। ঈমানের উপস্থিতিই নেই, সেখানে কিভাবে আরেক মুসলমানের জন্যে মায়া-মমতার সৃষ্টি হবে!

ইমাম সাহেব অনুরোধ করলেন, তাঁর সাথেই রাতের আহার গ্রহণ করতে হবে। আমি বিনয়ের সাথে তাঁকে জানালাম, আর কিছুক্ষণ পরেই আমাকে ফ্লাইটে উঠতে হবে। এখুনি এয়ারপোর্টে পৌছতে না পারলে ফ্লাইট ছেড়ে যাবে। তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোন্ এয়ার লাইন্সে বাংলাদেশে যাবো। আমি জানালাম, সাউদী এয়ারলাইন্স। এবারে তিনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বললেন, 'সাউদী এয়ারলাইন্সের ক্ষমতা নেই আপনাকে না নিয়ে উড়ে যাবে। আমি আমার গাড়ি দিয়ে আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিবো ইনশাআল্লাহ্।'

তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে তাঁরই সাথে খেতে বসলাম। খাদ্য হিসেবে সম্মুখে নিয়ে আসা হলো সাউদী আরবের বিখ্যাত খাদ্য 'খ্যাঁফ্সা'। এটি কি ধরণের খাদ্য তা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি। যদিও বহু বাংলাদেশী নাগরিক এই খাদ্য বেশ মজা করে খায়, কিন্তু আমি তৃপ্তিভরে খেতে পারি না। এবারে সাউদী আরব আসার পর থেকেই এই 'খ্যাঁফ্সা' আমার পিছু নিয়েছে, বিদায়ের ক্ষণ পর্যন্তও 'খ্যাঁফ্সা' আমার

পিছু ছাড়লো না। ইমাম সাহেবের সাথে খাওয়া শেষ করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিদায় মুহূর্তে তিনি আমার হাত চুম্বন করলেন, আমিও তাঁর হাত চুম্বন করে সালাম জানিয়ে ঈমানদার এক ভাইকে ছেড়ে যাওয়ার গোপন কষ্ট বুকে নিয়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠে বসলাম। ক্ষণপূর্বে যাকে ছেড়ে এলাম, পুনরায় আর কোনো দিন এই পৃথিবীতে তাঁর সাথে আমার দেখা হবে কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর অনেক স্মৃতি এই গাড়িতে জড়িয়ে রয়েছে।

দেশের পথে– চিন্তা সাগরের অতল তলদেশে

সাউদী এয়ারলাইন্স রাতে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। বিশ দিন পর পুনরায় আমার প্রিয় দেশবাসীর সান্নিধ্যে যাচ্ছি। এই বিশদিনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে নানা আইন-কানুন জারিসহ অনেক কিছুতেই পরিবর্তন এনেছে। অনেক পরিচিত ব্যক্তিত্ব এর মধ্যে কারাগারে প্রবেশ করেছেন। কত দিন পরে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, কোন্ দলের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসবে, এসব নানা চিন্তায় মাথার স্নায়ুগুলো বেশ সচল ছিলো।

কিন্তু সকল কিছুর ওপরে আরব লীগ সম্মেলনে সাউদী বাদশাহর সাহসী উচ্চারণ এবং শায়েখ খাল্লাকীর বলা কথাগুলোই আমাকে বেশী প্রভাবিত করেছিলো। সাউদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ্ মুসলিম জাহানের কল্যাণে এবার সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ফিলিস্তিনে মুসলমানদের আত্মঘাতী সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্যে তিনি মুসলমানদের দুশমনদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হামাস এবং ফাতাহ্ দলের নেতৃবৃন্দকে মক্কায় ডেকে এনে উভয়ের দ্বন্দ্ব দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

মুসলমানদের দুশমনরা শিয়া-সুন্নীর ধুম্রজাল সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পুরনো চক্রান্তে নতুন রূপ দিতে তৎপরতা চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে তারা ইরাককে খন্ড খন্ড করাসহ সাউদী আরবকেও খন্ড-বিখন্ড করার মানচিত্র প্রস্তুত করেছে। ইয়াহূদীরা তাদের স্বরচিত ধর্মগ্রন্থে মদীনার বিশেষ অংশ ও খায়বরসহ সাউদী আরবের বিভিন্ন এলাকা নিজেদের বাসভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং তারা নতুন মানচিত্রেও তা দেখিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকা এসব ঘৃণ্য কাজে তাদেরকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের দুর্বল করার উদ্দেশ্যে সামরিক শক্তির দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ইরাকের ওপর দীর্ঘ কয়েক বছর অবরোধ আরোপ করেও ক্ষান্ত হয়নি, যুদ্ধের নামে এক তরফা আক্রমণ করে ইরাককে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছে। ইরাক ও আফগানিস্থান দখল করে প্রতিদিন সেখানে মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করছে।

ফিলিস্তিন ও সোমালিয়ায় মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। ইতোপূর্বে তারা **'ইউরোপের বুকে মুসলিম রাষ্ট্র সহ্য করা হবে না'** ঘোষণা দিয়ে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মুসলিম গণহত্যা চালিয়েছে। এবার সিরিয়া, পাকিস্তান ও ইরানকে ধ্বংস করার জন্যে প্রকাশ্যে হুঙ্কার দিচ্ছে। এসব কিছুর প্রেক্ষাপটে সাউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে আরব লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বেশ কিছু দিন ধরেই পাশ্চাত্যের ইলেক্‌ট্রোনিক মিডিয়াসমূহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে শিয়া জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান দেয়া শুরু করেছে। অর্থাৎ মুসলমানদের দুশমনরা মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বিভক্তি রেখা টানার অপচেষ্টা করছে। কিন্তু সাউদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ্ যথাসময়ে ইরানি প্রেসিডেন্ট আহ্‌মাদিনেজাদকে সাউদী আরবে সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানিয়ে এবং গোষ্ঠীবাদকে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে বিষতুল্য সাব্যস্ত করে দুশমনদের এ কথা বুঝিয়ে দিলেন যে, খাদেমুল হারামাইনিশ্‌ শারিফাইন পাশ্চাত্যের এ ধরণের বিদ্বেষমূলক প্রচারণা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছেন।

সাউদী বাদশাহ যৌক্তিক কারণেই মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আরব লীগ সম্মেলনে তিনি অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের প্রতি স্পষ্ট আহ্বান জানিয়েছেন, শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে ইয়াহূদীদেরকে শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থায় ইসরাঈলকে ফিরে যেতে হবে। শান্তি পরিকল্পনা যদি তারা না মানে তাহলে তাদের ভাগ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

আরব লীগ সম্মেলনে বাদশাহ্ আব্দুল্লাহর এই সাহসী ও সময়োচিত ঘোষণা নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহ্‌র দেহে যেনো নবপ্রাণের সঞ্চার করেছে। জুলুম অত্যাচারে প্রাণ ওষ্ঠাগত মুসলিম উম্মাহ্ তিমিরাবৃত সূচিভেদ্য অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পেয়েছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নিষ্পেষিত মুসলিম উম্মাহ্ ঘুরে দাঁড়ানোর ইশারা দেখতে পেয়েছে বাদশাহ্ আব্দুল্লাহর সাহসী উচ্চারণের মধ্যে।

সাউদী বাদশাহ একবার যদি মহান আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভর করে মুসলিম বিশ্বকে স্বকীয় আদর্শ আঁক্‌ড়ে ধরে নিজ অবস্থানে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান, তাহলে শুধু মধ্যপ্রাচ্যই নয়– সম্পূর্ণ বিশ্ব পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আরব লীগ, ওআইসি এবং মুসলমানদের অন্যান্য বিশ্ব সংগঠনও নেতৃত্বের শূন্যতা কাটিয়ে উঠে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। তিনি যদি পবিত্র কা'বা শরীফের দরজার গেলাফ ধরে অসীম ক্ষমাশীল আল্লাহর কাছে আবেদন করেন, **'হে আল্লাহ! আমার সকল ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিয়ে হযরত উমার (রাঃ)-এর যোগ্যতা আমার মধ্যে দাও, আমি যেনো মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারি।'**

এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে সারা দুনিয়ার অবহেলিত উপেক্ষিত ও নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহ্ কাতার বন্দী হয়ে বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ্র পেছনে দাঁড়াবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

একদিকে সাউদী বাদশার সাহসী উচ্চারণ এবং মুহ্তারাম খাল্লাকীর কথাগুলো আমাকে চিন্তার সাগরের অতল তলদেশে নিয়ে যাচ্ছিলো। সংখ্যা স্বল্পতা থাকার পরও মুসলমানরা অতীতে সংখ্যা গরিষ্ঠ ও আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত দুশমনদেরকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেছে শুধুমাত্র ঈমানী শক্তি দিয়ে। সেই ঈমানী শক্তি পুনরায় মুসলমানদের দুশমনদের মোকাবেলায় দৃঢ়পদে দাঁড় করাতে পারে। আর এ জন্যে প্রয়োজন মুসলিম উম্মাহ্র একটি শক্তিশালী জামায়াত। এবং সেই জামায়াতকে শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাবীব আল খাল্লাকীর গবেষণালব্ধ আবিষ্কারে সজ্জিত হতে হবে। অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মতো সাংগঠনিক মজবুতি, তাবলিগ জামায়াতের বিনয় এবং সাল্ফে সালেহীন-এর বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস।

এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হলেই সাহাবায়ে কেরামের কিঞ্চিৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ঈমানের বলে বলিয়ান মানুষ গড়া সম্ভব। আর এই মানুষগুলো দিয়েই সমাজ, দেশ ও সমগ্র বিশ্বকে দুর্বৃত্ত মুক্ত করে শান্তির শ্বেত কবুতর পৃথিবীময় উড়িয়ে দেয়া সম্ভব। কিন্তু কিভাবে– কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে উক্ত তিনটি গুণের সমন্বয় সাধন করা সম্ভব, এ চিন্তা আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিলো যে, কখন সউদী এয়ার লাইন্স বাংলাদেশের জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করেছে আমি জানতেই পারিনি। প্রবল ঝাঁকুনিতে আমার চিন্তার জাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি সবদিকেই আমার একান্ত প্রিয় পরিচিত পরিবেশ।

বিমানের ইঞ্জিন সাট-ডাউন হওয়ার সাথে সাথে ছোট্ট ট্রলি ব্যাগটি নিয়ে নেমে পড়লাম। বোর্ডিং ব্রিজ দিয়ে এগিয়ে গেলাম ভিআইপি লাউঞ্জের দিকে। ওখানে অপেক্ষা করছিলো বিদেশ থেকে ফেরার সময় প্রতিবারের মতো আমার জ্যোষ্ঠ পুত্র মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী, মেজ ছেলে শামীম সাঈদী, সেজ ছেলে মাসউদ সাঈদী। ওদের সাথে এবার আরো যোগ দিয়েছে লন্ডন প্রবাসী আমার কনিষ্ঠ পুত্র নাসীম সাঈদী– সে দু'বছর পর মাত্র ক'দিন আগে দেশে ফিরেছে।

(চেয়ে দেখো) এ হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ী, তাদেরই জুলুমের কারণে তা জনশূন্য বিরাণ হয়ে পড়ে রয়েছে। অবশ্য এ ঘটনার মধ্যে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে শিক্ষার অনেক নিদর্শন রয়েছে।

-সূরা নামল-৫২